ধূম্রজালে মৌলবাদ

জহুরী

ধূম্রজালে মৌলবাদ

জহুরী

দিলরুবা প্রকাশনী

www.pathagar.com

ধূম্রজালে মৌলবাদ

প্রকাশনায়ঃ
দিলরুবা প্রকাশনী
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রথমপ্রকাশঃ
১৭ই চৈত্র, ১৩৯৫
২৩ শে শাবান, ১৪০৯
৩১ শে মার্চ, ১৯৮৯

মুদ্রণে
ক্রিসেন্টপ্রিন্টিংপ্রেস
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ একেছেনঃ
হামিদুলইসলাম

প্রাপ্তিস্থান
প্রফেসার্স বুক কর্ণার
১৯১ এলিফ্যান্ট রোড বড়,
মগবাজার ঢাকা-১২১৭

আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরীষ দাস লেন, ঢাকা।

মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২ বংলাবাজার
ঢাকা।

প্রীতি প্রকাশনী
১৯১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মূল্যঃ হোয়াইট প্রিন্ট ২৫ টাকা
নিউজ প্রিন্ট ১৫ টাকা

www.pathagar.com

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

১৩৪৮ বাংলা সনের ৬ই কার্তিক থেকে ২০শে কার্তিক; মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে প্রথমে আমার আম্মা এবং পরে আব্বা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। আমি তখন মাত্র চার বছরের শিশু। এই অসহায় এতিম শিশুর লালন পালন ও মানুষ করার দায়িত্ব নেন আমার বড় খালা। তাঁর স্নেহের কোলে, আদরে সোহাগে আর মানুষ করার শাসনে কেটেছে আমার জীবনের আঠার বছর। তিনিও এখন জান্নাতবাসিনী। আমার জীবন গঠনে তাঁর ভূমিকাই মূখ্য। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানা আমার এই স্নেহময়ী বড়খালার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে– জহুরী।

www.pathagar.com

মৌলবাদ ও নাস্তিক্যবাদ

"মৌলবাদ শব্দটির অর্থ কি? একটি ধর্মের মূল আদর্শকে আবিষ্কার করে তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা। এটাই মৌলবাদিতা। এটা তো কোন অপরাধ হতে পারেনা। কোন মানুষ যদি তার ধর্মের মূল আচরণের মধ্যে প্রবেশ করে সেই আচরণকে অবলম্বন করতে চায় তাহলে তার মধ্যে অপরাধ কোথায়?.....আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিরা নাস্তিকতা প্রচারের পথটাকে সুগম

করতে চান 'মৌলবাদী' শব্দটি ব্যবহার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন নাস্তিকতা প্রচার রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা, আমাদের দেশে যদি একই ভাবে ইসলাম প্রচার রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা হতো তাহলে কি অপরাধ হতো? আমাদের দেশ কম্যুনিষ্ট দেশ নয় এবং এদেশের মানুষ নাস্তিকতাকে কখনো গ্রহণ করবে না। কয়েকজন মাত্র শিখণ্ডি যদি নাস্তিক থাকে তাহলে তাদের চীৎকারে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এখানে মৌলবাদ কথাটি একটি অর্থহীন শব্দ মাত্র। ইসলামে (মৌল আছে কিন্তু) মৌলবাদের কোন সুযোগ নেই। ইসলাম যেহেতু মানুষের সার্বক্ষণিক কর্মসাধন প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে এবং সুশৃংখল ভাবে গড়ে তোলতে চায়, সুতরাং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের সংগে তুলনা করা চলে না। এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছিল সুফীদের সাহায্যে। তাঁরা মমতা ও মানবীয়তার সাহায্যে এদেশের মানুষকে মুসলমান করেছিলেন। তারা যুদ্ধ করেননি, ভালবাসার সাহায্যে মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের বিপক্ষ হিসাবে যখন মুসলমান দণ্ডায়মান হলো, তখনই মুসলমানদের আচরণকে "মৌলবাদী" বলে আখ্যায়িত করা হলো। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে কোন দলের রাজনৈতিক বিপক্ষ নেই। সুতরাং এই অর্থে মৌলবাদ কথা এখানে সম্পূর্ণ অচল।"

"নাস্তিক্যবাদ হচ্ছে একটি শূন্যতা, একটি বিশ্বাসহীনতা এবং একটি আদর্শহীনতা। একে এক প্রকার "নিহিলিজম" বলা যেতে পারে। বিশ্বাস যেখানে মানুষকে অভয় দেয়, শান্তি দেয় এবং অবলম্বন দেয়, নাস্তিকতা সেখানে মানুষকে ক্ষোভ এনে দেয় বিরুদ্ধতা এনে দেয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপরই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি নিজেদের একাত্তরের পটভূমি মুছে ফেলবার জন্য নাস্তিকতা ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছেন।"

—সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় আল মাহমুদ বলেন–

জহুরী আমার প্রিয় কলাম লেখকদের একজন । তাঁর লেখার দায়িত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি কোনো কোনো সময় আমাকে অভিভূত করে রাখে। বিষয় বিশ্লেষণের জন্য একজন কলাম লেখকের যে প্রত্যুৎপন্ন মতামত একান্ত দরকার তা জহুরী খুব ভালোভাবেই আয়ত্বে রেখেছেন। বহুকাল যাবৎ তার লেখা আগ্রহ সহকারে পড়ছি। এই আগ্রহ কোনোদিন কমবে বলে ভাবিনা। এটাই সম্ভবত তার সাফল্য। সম্প্রতি তার মৌলবাদ সম্পকিত কিছু প্রতিবাদী ও তথ্যবহুল রচনা পাঠ করে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা আন্দাজ করতে পারছি। এক কথায় বলা যায়, জহুরী আমাদের দেশে এক অসাধারণ সাংবাদিক–প্রতিভা। এ ধরণের সাংবাদিকগণই আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তার মৌলবাদ সম্পর্কিত রচনাগুলো যদি তিনি একটি বইয়ে সংকলন করেন, তবে সাধারণ পাঠকগণের খুবই উপকার হয়।

www.pathagar.com

প্রকাশিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ। প্রকাশনা অংগনে এই আমার প্রথম পদার্পণ। জহুরী সাহেবের 'ধূম্রজালে মৌলবাদ' পুস্তক খানা নিয়েই আমার যাত্রা হলো শুরু। প্রকাশনা-যাত্রার পথ পরিক্রমায় আমার পহেলা কদমের মৌল অবলমন এই মৌলবাদ পুস্তক। 'মৌল' থেকেই যাত্রা শুরু করলাম, ভবিষ্যত এলাহি ভরসা। আমার চিন্তা চেতনায় যা কিছু আছে, সবই সৎবৃক্ষ কালেমায়ে তাইয়্যেবার গভীরতম শিকড় বা মৌল উৎস থেকে ইহকাল ও পরকালের জীবন-সুধা আহরণ করে থাকে। সুতরাং আমি সর্বাবস্থায় মৌল-পন্থী, কখনো পল্লব-পন্থী নই। এজন্য অমৌলের কোন চকমকা মেকী উপকরণ আহরণ করে আমার প্রথম সওগাত পাঠকদের খেদমতে উপহার দেয়ার চিন্তাও করিনি। এই মৌল মন মানসিকতা আমাকে 'লাভ আর লোভের' পথে চলতে দেয়নি। এই বাধাটা বোধহয় আমার জন্য শাপে বরই হলো।

'মৌলবাদ' গালিটি আমার অহংকার, আমার গর্ব। বাংলা ভাষায় মৌলবাদের উপর কোন বই বাজারে আছে বলে আমি জানিনা। আমার মনে হয়, 'ধূম্রজালে মৌলবাদ'-এবিষয়ের ওপর এটাই প্রথম পুস্তক। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তক পাঠ করে তারাই বেশী আনন্দ পাবেন, যারা 'মৌলবাদী' গালি শুনেন। অমৌলবাদীদের জন্য এই পুস্তক পাঠ নিষিদ্ধ। কারণ এই পুস্তক তারা পাঠ করলে 'অমৌলবাদী ঈমান' আর 'ধর্মনিয়পেক্ষবাদী' ভ্রান্তিবিলাস বরবাদ হয়ে যাবে। তবে কেবলী পরিবর্তনের কোন খায়েশ তাদের থাকলে গোপনে 'ধূম্রজালে মৌলবাদ' পড়তে পারেন।

আমি পুস্তকটির প্রকশনার দায়িত্ব নিয়ে মোটেই ঠকিনি। আপনারা ক্রয় আর পাঠ করেও ঠকবেন না বলে আমি বিশ্বাস করি। রাব্বুল আলামীন আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে যেন কবুল করে নেন, তাঁর কাছে এই আমার ভিক্ষা।

— দিলরুবা বেগম

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা
২। জহুরীর জামিল
৩। ধূম্রজালে মৌলবাদ

প্রকাশের অপেক্ষায়

৪। খবরের খবর
৫। মাস্তানদের জবানবন্দি
৬। প্রেষ্টিজ কনসার্ণ
৭। জাত নিয়ে ভ্রান্তি বিলাস

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ-

পাঠক পাঠিকা সমীপে আগাম কিছু কথা – ৯
গাছের মৌল অংশ হচ্ছে গাছের শিকড় – ১৪
মৌলবাদী ও অমৌলবাদীদের কোরআনী উপমা – ১৬
মৌলবাদ একটি গালি না আশীর্বাদ ? – ১৮
মৌলবাদ অমৌলবাদীদের শ্রেণী বিভাগ – ১৯
"মৌলবাদ মানে মূলা" – ২০
ইসলামের মৌলবাদ অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদ থেকে পৃথক – ২৩
মুসলিম নামের অমৌলবাদীদের স্বরূপ – ২৪
"মৌলবাদীদের ঠেকানোর জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" – ২৮
বাংলাদেশে মৌলবাদ – ৩৫
বাংলাদেশে মৌলবাদ শব্দের রপ্তানী – ৩৬
ইসলামের মূলোৎপাটনে মোস্তফা কামাল – ৩৮
ধর্মনিরপেক্ষ অমৌলবাদী নাসেরের কথা – ৪৬
খৃস্টান জগতে মৌলবাদ – ৫৩
কম্যুনিস্ট জগতে মৌলবাদ – ৫৭
ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদঃ লা–দ্বীন মতবাদ – ৬৬
ভুল তরজমাঃ 'সেক্যুলার' কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা নয় – ৬৭
সেক্যুলার শব্দের প্রকৃত তরজমা কি ? – ৭০
ওদের নিরপেক্ষতার স্বরূপ – ৭৮
বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম প্রবেশ – ৮২

www.pathagar.com

পাঠক–পাঠিকা সমীপে আগাম কিছু কথা

যে কোন কাজ বা কাজের ফলাফলের মূলে থাকে কোন না কোন পটভূমি। পুঁথি–পুস্তকের ক্ষেত্রে এই পটভূমিকে বলা হয় ভূমিকা। প্রয়োজনে অনেক পুস্তকে ভূমিকা থাকে, আবার অনেক পুস্তকে প্রয়োজন নেই বলে কোন ভূমিকা থাকে না। 'ধূমজালে মৌলবাদ' এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সম্মানিত পাঠক– পাঠিকা সমীপে ভূমিকা স্বরূপ কিছু বক্তব্য পেশ করতে হচ্ছে। এই পুস্তকে প্রবেশের আগেই আমার কিছু আগাম কথা যদি পাঠক পাঠিকা অনুগ্রহ করে শুনেন, তাহলে আশা করি পুস্তকে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রাসংগিকতা নিয়ে নতুন কোন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটবে না। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে আমি তাদের খেদমতে কিছু বক্তব্য রাখছি।

[এক] পুস্তকটির নাম থেকে শুরু করে ভেতরের প্রায় সবগুলো পৃষ্ঠায় আমি বহুবার 'মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি। কারণ, এই পুস্তকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় 'মৌলবাদ'। তাই পুস্তকখানা হাতে নিয়ে শিরোনামের দিকে নজর দেয়ার সাথে সাথে অনেক সুধীজনের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, ইসলামে 'মৌলবাদ' বলতে তো কিছুই নেই, তবে কেন লেখক মৌলবাদকে স্বীকার করে নিয়ে এই আলোচনা করলেন?

প্রশ্নটি বিলকুল সঠিক। এমন প্রশ্ন যার মনেই সৃষ্টি হবে আমি তার সেই প্রশ্নের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা না করে পারি না। এ সম্পর্কে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে এই, ইসলামে কোন 'বাদ– টাদ' বা 'ইজম– টিজম' নেই। মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের সর্ব প্রকার প্রশ্নের সঠিক উত্তর এবং সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম এই পরিপূর্ণতার জন্য স্বীয় দক্ষতা, যোগ্যতা ও শক্তি–সামর্থে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। বলা বাহুল্য, এই স্বনির্ভরতার কারণেই ইসলামকে 'বাদ– টাদ' আর 'ইজম– টিজমের'লাঠি বা ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলার প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামে সমাজ–গঠন ও পরিচালনার বিধি–বিধান আছে, কিন্তু তন্ত্র–মন্ত্র নেই। অনুরূপভাবে ইসলামের 'মৌল' আছে, 'মৌল'নীতি আছে, 'মৌল' ভিত্তি আছে, কিন্তু 'বাদ টাদ' নেই।

www.pathagar.com

আমার এই বিশ্বাস আমার মধ্যে মজবুতভাবে অবস্থান করার পরও আমি কেন 'মৌল'–এর সঙ্গে 'বাদ' যোগ করলাম, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। এ সম্পর্কে আমার কৈফিয়ত হচ্ছে এই, আমি যদি মৌলবাদের 'মৌল'কে রেখে 'বাদ'–কে বাদ দিয়ে আলোচনা করতাম, তাহলে আলোচনার বিষয়বস্তু অনেকের বোধগম্য হতো না বরং তা হতো 'আমার জন্য আমার আলোচনা' মাত্র। যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাষায় ও শব্দে গালি দিল, সে গালির জন্য তার বিরুদ্ধে আমি বিচার চাইলাম। বিচারকরা বিচারে বসলেন; কিন্তু বিচারকদের কাছে ঐ গালিটাকে পূর্ণ অবয়বে পেশ করলাম না, অথচ আমি বিচারকদের কাছে আমার অনুকূলে রায় চাইতে থাকলাম। এখন প্রশ্ন, বিচারকরা কি বুঝলেন? রায়ই বা কি দেবেন? সুতরাং সেই গালিকে গালিদাতার উচ্চারণে বিচারকদের কাছে আগে পেশ করা আমার উচিত নয় কি? এখানে পাঠক–পাঠিকা আমার বিচারক। তাদের বিচারালয়ে গালিদাতার ভাষাও আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চারণ করতে আমি বাধ্য। 'মৌলবাদ' বার বার উচ্চারণ করার এটাই আমার প্রধান কৈফিয়ত।

মনে করুন, পচা পুকুরে কোন ব্যক্তি আমারই চোখের সামনে পা পিছলিয়ে পড়ে গেছে। আমি সামনে থাকার কারণে তাকে উদ্ধারের নৈতিক দায়িত্বএকমাত্র আমার। এখন বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে হলে পচা পানিতে না নেমে তো পারি না। একই ভাবে ইসলামের 'মৌল'কে 'বাদ' এসে যে ভাবে বরবাদ করছে, সেই বরবাদি থেকে 'মৌল'–কে রক্ষা করতে হলে 'বাদ' এর সংগে ধস্তাধস্তি আমাকে করতেই হবে। এ জন্য এই 'বাদ'–এর সংগে বাক–বিতণ্ডা করছি এবং বার বার 'মৌলবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করেছি।

[দুই] খৃস্টান ও কম্যুনিস্ট জগতে মৌলবাদী হওয়াটা রীতিমত একটা গৌরব। মৌলবাদী হওয়ার মধ্যেই মতাদর্শের নিষ্ঠার পরিচয় নিহিত। তাদের এই দাবি তাদের অবস্থানে সঠিক বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কে 'খৃস্টান জগতে মৌলবাদ' ও 'কম্যুনিস্ট জগতে মৌলবাদ' শীর্ষক আলোচনায় এই দিকটি আমি তুলে ধরেছি। আমি সাক্ষ্য–প্রমাণসহ মন্তব্য করেছি যে, তারা তাদের মৌল আদর্শ থেকে বহু দুরে সরে যাওয়ার পরও আদি ও মৌলপন্থী হওয়ার দাবি

www.pathagar.com

ত্যাগ করছেন না, যদিও আদি আর মৌলের কোন চিহ্ন তাদের অংগে নেই, বিশেষ করে কম্যুনিস্টদের। খৃস্টান মৌলবাদীরা ধর্মভিত্তিক; কিন্তু কম্যুনিস্ট মৌলবাদীরা ইহুদী সন্তান কার্ল মার্কস-এর বস্তুবাদী দর্শন ও শ্রেণী সংগ্রামের পেট-সর্বস্ব মতবাদ ভিত্তিক। এজন্য কম্যুনিস্টদের আন্দোলন ইহুদীদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, মোনাফেকী আর উৎপাত-উপদ্রবের দীর্ঘ ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত। এই কমুনিস্টরা কম্যুনিস্ট-জনকের ইহুদী রক্ত ও চরিত্রের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তাদের খাসিলত ইহুদী খাসিলতের খুবই কাছাকাছি। এই পুস্তকে সেই ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হয়নি বটে, তবে কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের কতিপয় নির্ভুল দৃষ্টান্ত এবং তাদের কর্তাব্যক্তিদের মন-মানসিকতার দিকটি এই পুস্তকে তুলে ধরেছি।

[তিন] মোস্তফা কামাল আর জামাল আবদুন নাসেরের জীবন ও আচরণ পৃথক পৃথক শিরোনামে আলোচনা করেছি। দু'টি কারণে তাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (১) বাংলাদেশের মানুষ যেন জানতে পারে, এই বিংশ শতাব্দিতে ইসলাম-উৎখাত আন্দোলনের মুসলিম নামধারী অগ্রপথিক কারা। এই সংগে বাংলাদেশী মোস্তফা কামালদের আর জামাল আব্দুন্ নাসেরদের সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানকেও সতর্ক করে দেয়া। (২) বাংলাদেশে যারা মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন করছেন, তাদের বক্তৃতা বিবৃতি, হুঙ্কার, ধমক আর কর্মনীতি হুবহু কামালী আর নাসেরী কর্মনীতি, হুমকি ও ধমকির অনুরূপ। একথা শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, এক রসুনের সব কোষের নীচের জয়েন্ট একখানে।

[চার] ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি পুস্তকের শেষাংশে। সেই আলোচনার শুরুতেই প্রাসঙ্গিকতার কৈফিয়ত পেশ করেছি। এই আলোচনা থেকেই পাঠকগণ জানতে পারবেন যে, মৌলবাদ বিরোধী অভিযানের প্লাটফরম হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতার প্লাটফরম'। অতএব, এইপ্লাটফরমকে আমাদের ভালভাবে চেনা দরকার। মশার প্রজনন ক্ষেত্র কোথায়, তা জানা না থাকলে মশক দমন বা প্রতিরোধ অভিযান কখনও সফল হয় না। 'সেক্যুলার' শব্দের বাংলা তরজমা কোন অবস্থাতেই, এমনকি ভাবার্থেও যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয়,

www.pathagar.com

সে আলোচনা আমি তথ্য-প্রমাণসহ করেছি। এই ভুল তরজমার ইতিহাসও সংক্ষেপে পেশ করেছি। সেক্যুলার বিরোধী বাংলাদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই ভুল তরজমার ভুল কেন যে এতদিন ধরতে পারলেন না, তা আমার কাছে একটা বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নয়। পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ, এই 'ধর্মনিরপেক্ষতার' আলোচনা যেন মনোযোগের সংগে পাঠ করেন এবং 'সেক্যুলার' শব্দের বাংলা তরজমা আর কখনো যেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ দ্বারা না বুঝেন বা এই তরজমা উচ্চারণ না করেন।

এখন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। 'অপসংস্কৃতির বিভীষিকা' এবং 'জহুরীর জামিল' প্রকাশের পর 'মাস্তানদের জবানবন্দি' নামে একখানা পুস্তক রচনা ও প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরিকল্পনা মোতাবেক 'মাস্তানদের জবানবন্দি' পুস্তকের লেখার প্রায় অর্ধেক কাজ দেড় বছর আগে শেষ করেছি; কিন্তু বাকি অর্ধেক আজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সংসারের 'হার্ডল রেস' থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তবে বাকি কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছাটা কিন্তু আমাকে প্রায়ই তাড়া করে থাকে। এই হার্ডল রেস- এর মধ্যে এক ফাঁকে আমাকে খপ করে ধরে ফেলেন বন্ধুবর জনাব আবদুল কুদ্দুস। ধরেই তিনি 'ধূমজালে মৌলবাদ' পুস্তকখানা লিখে দেয়ার দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দেন। কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না। তারপর শুরু করেন তাগাদার পর তাগাদা। পাণ্ডুলিপির জন্য তাঁর তাগাদা ছিল কাবুলীর তাগাদার চেয়েও বেশী শানিত। এই নাছোড়বান্দা লোক পিছনে লেগে থাকার কারণে শুরু করি বিষয়-ভিত্তিক পড়াশুনা আর মাল- মসলা সংগ্রহ। বাজারে মৌলবাদ সম্পর্ক কোন বই নেই এবং এদেশে এই ইস্যু ও আগে কখনো ছিল না। সুতরাং এই নতুন ইস্যুর ওপর তথ্য সংগ্রহ যে কত কঠিন, তা আমি কঠিন ভাবে বুঝেছি। পূর্ণ একমাস বিষয়-ভিত্তিক পড়াশুনা ও তথ্য সংগ্রহে অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে লেখার কাজে হাত দেই। অর্ধেক লেখা শেষ করে আবার কিছু তথ্যের জন্য প্রায় তিন সপ্তাহ ঘোরাফেরা করি। অতঃপর কিছু তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর আবার লেখা শুরু করি। এই লেখা-লেখি মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শেষ হয়েছে। নতুন বিষয়ের এই লেখালেখিতে

www.pathagar.com

ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা এদিকে ইঙ্গিত করলে দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ-বিয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিআইসি-এর পরিচালক জনাব নাজির আহমদ ইংরেজী বিশ্বকোষসহ অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ দেখা ও তা থেকে নোট করার, এমনকি বাইরে নিয়ে ফটোস্ট্যাট করার অবাধ সুযোগ দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর সহযোগিতার কথা স্মরণ করি। বন্ধুবর আবদুল কুদ্দুসের কাবুলী-স্টাইল তাগাদা না থাকলে আমার মহা ব্যস্ততার মধ্যে রাত জেগে এই বই লেখা আগামী এক দু'বছরেও সম্ভব হতো কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আমার ভাতিজা সৈয়দ শাহেদুল হক এবং আমার বড় ছেলে কাওসার উদ্দিন মাহমুদ আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ-এর জনাব মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদকে আমি নানাভাবে জ্বালাতন করেছি। তিনি আমার সব জ্বালাতন নিরবে সহ্য করে আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। আমার গিন্নীর সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে ছিল অতুলনীয়। এ ধরণের কাজে আগামীতে এমন সহযোগিতা তার থেকে পাওয়ার আগাম আর্জি পেশ করে ব্যক্তিগত এই প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানছি।

যে নিয়তে এই মেহনত,রাব্বুল আলামীন তা যেন কবুল করে নেন, তাঁর দরবারে এই আমার মোনাজাত।

সালেহ উদ্দিন আহমদ (জহুরী)।

স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম ও ডাকঘরঃ- কদম রসুল
উপজেলাঃ- গোলাপগঞ্জ
জেলাঃ-সিলেট

বর্তমান ঠিকানাঃ
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

তারিখঃ ৩ রা চৈত্র ১৩৯৫, ৯ই শাবান ১৪০৯, ১৭ই মার্চ ১৯৮৯

www.pathagar.com

গাছের মৌল অংশ হচ্ছে গাছের শিকড়

গাছের মৌল অংশ বলতে আমরা বুঝি শিকড়। গাছের কান্ড কলতে বুঝি মূল বা শিকড় থেকে শাখা পর্যন্ত অংশ, যাকে গুঁড়িও বলা হয়ে থাকে। গাছের গুঁড়ি বা গোড়ার অংশের পর থাকে শাখা-প্রশাখা। শাখা-প্রশাখায় থাকে পাতা আর পাতা। পাতার আয়ু খুবই কম; কিন্তু বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত। বাড়ে, বুড়ো হয় আর ঝরে পড়ে হালকা বাতাসে, এমনকি বিনা বাতাসেও। আমাদের দেশে অনেক প্রকার গাছ আছে, তন্মধ্যে কয়েক প্রজাতির গাছের পাতা বছরে একবার ঝরে পড়ে। বসন্ত ঋতুতে তো কোন কোন গাছকে পাতাশূন্য মরা গাছের মত মনে হয়। এই ঋতুতে মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে পাতাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। পাতা কুড়ানীরা পাতাগুলো কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে যায়। তারপর পাতাগুলো চুলায় দিয়ে রান্নার ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে। গাছের কোন কোন শাখাও কখনো কখনো শুকিয়ে কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে, কখনো বা মাটিতে পড়ে যায়। অনেক সময় গাছের মালিক মরা ডালকে হেঁচকা টান দিয়ে বা কুড়াল দিয়ে কেটে গাছ থেকে আলাদা করে থাকে।

বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত বিশ্বের শত কোটি মুসলমান মূলত ইসলামের মৌল উৎস থেকে সৃষ্ট, নির্গত ও বিস্তৃত। ঈমানী মজবুতীর মাত্রা অনুযায়ী মুসলমান জাতি মিল্লাতে ইসলামীয়ার বিভিন্ন সিঁড়িতে অবস্থান করলেও সকলেরই নাম মুসলমানদের খাতায় রয়েছে। নীচের সিঁড়ির দুর্বলতম ঈমানের মুসলমানও মুসলমানী খাতায় থাকতে পছন্দ করেন, তবে যতটা ঈমানী কারণে; তার চেয়ে বেশী বৈষয়িক স্বার্থে। মোট কথা, কারো অবস্থান মূলে আর কাণ্ডে, কারো অবস্থান শাখা-প্রশাখায় আর অনেকের অবস্থান পাতায় পাতায়। যারা শাখায় শাখায় আর পাতায় পাতায়, তারা সংগত কারণেই অবস্থানের দিক থেকে মৌল অংশের বাসিন্দা নন; এ কথা অমৌলবাদীরাও স্বীকার করেন।

শিকড় গাছের আহার যোগায়। অর্থাৎ শিকড় হচ্ছে গাছের আহার সংগ্রাহক। শিকড় যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন গোটা গাছ বেঁচে থাকে। শিকড় না বাঁচলে কাণ্ড বাঁচে না, কাণ্ড না বাঁচলে শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লবের কল্পনাও করা যায় না। যেমন কল্পনা করা যায় না, 'ইসলামের মধ্যে মুসলমানরা নেই অথচ

www.pathagar.com

মুসলমানগণ তাদের মুসলিম পরিচিতি নিয়ে সগৌরবে জীবন যাপন করছেন'। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার দিকে তাকালে চোখের ছানি কেটে যাবে আর কারো ঝাপসা মনে সমাজতন্ত্রী রঙ্গীন মাকড়সা রঙ্গীন জাল বুনে থাকলে তাও দূর করা সম্ভব হবে। শিকড় বাঁচলে যেমন গাছ বাঁচে, তেমনি ইসলাম থাকলে মুসলিম পরিচিতি নিয়ে মুসলমানও বাঁচতে পারে। ইসলামী আমলই হচ্ছে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার মৌল পদ্বতি। গাছের শিকড়ের মত মুসলমানের মৌল উৎস হচ্ছে ইসলাম। গাছের কাণ্ড তথা মূল অংশ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবকে মাথায় করে রাখে, কিন্তু ঝড়-ঝাপটায় বরাবরই পত্র-পল্লব কাণ্ডের প্রতি অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করে। শিকড় থেকে পাতা পর্যন্ত গাছ- পরিবারের যত সদস্য আছে, প্রত্যেকেরই কমবেশী দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য, তবুও গুরুত্ব প্রত্যেকের এক মাপের আর একই পরিমাণের নয়। যে গাছের দশ-বিশ হাজার পাতা রয়েছে, তা থেকে দু'চার শত ঝরে পড়ে গেলেই বা কি, গাছের তো তেমন ক্ষতি হয় না। বসন্তে তো অনেক গাছের সব পাতাই ঝরে পড়ে, তখনও গাছ জিন্দাই থাকে। একটি গাছের ৩০/৪০ টি শাখার ৫/৭ টি যদি চুলার ইন্ধনের জন্য কাঠুরিয়া কেটেই নিয়ে যায়, তাতেই বা কাণ্ডের এমন কি ক্ষতিটা হবে শুনি? কিন্তু মৌল অংশ না থাকলে শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লবের সব বাহাদুরীর ইতি। মৌলবাদীরা হচ্ছে গাছের সেই মৌল অংশ, যা ছাড়া গাছের অস্তিত্ব পর্যন্ত কল্পনা করা যায় না। মৌল অংশ ধ্বংস হলে পত্র-পল্লব বাতাসে উড়ে, নালা-নর্দমায় ছড়িয়ে পড়ে। ঝড়-তুফান বান-ভাসি, খরা-বৃষ্টি যাই আসুক না কেন, গাছের কাণ্ড তার শিকড়ের সংগে নিবিড় ও মজবুত সংযোগ রক্ষা করে চলে। ঝড়-তুফানে সহজে এদিক-ওদিক হেলে পড়ে না। তখন শাখা-প্রশাখাগুলোকে দেখা যায়, বাতাস কান ধরে একবার এদিক আনছে আবার ওদিকে নিচ্ছে। এই দুরবস্থায়ও কাণ্ড তার শাখা-প্রশাখাগুলোকে সাধ্য-শক্তি দিয়ে ধরে রাখে। অমৌল ঐ শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লব যেমন হাওয়া তেমন নাচে বরং একটু বেশী নাচে, আর পাতাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। ওদের দায়িত্ব নেই এবং কোন রিস্কও নেই। বার বার ঝরে পড়ে আর বার বার জন্ম নেয়, এই তো তাদের খেলা।

www.pathagar.com

ইসলামের মূল ধরে থাকার কারণে যারা মৌলবাদী খেতাবে ভূষিত, তাদের মৌল ঈমান রয়েছে লা- শরীক আল্লাহর প্রতি 'ফেরেশতাদের প্রতি, রসুলদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি এবং পরকালের প্রতি। মুসলিম নামের অমৌলবাদীদের অমৌল ঈমান কি তাহলে মৌলবাদীদের ঈমানের সংগে সাংঘর্ষিক? যদি তাই হয়, তবে অমৌলবাদীদের ঈমানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা কি?

মৌলবাদীদের ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত- (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ আঃ) আল্লাহর রসুল, (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া। (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। অমৌলবাদীদের ঈমানের ভিত্তিগুলো কি জানতে পারি?

মৌলবাদীরা তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। তারা এখন আল্লাহর পথে লড়াই করে মারবে ও মরবে। এটাকেই তারা জীবনের বড় সাফল্য মনে করে। অমৌলবাদীরা কি বস্তুর বিনিময়ে কা'র কাছে নিজেদের মৌল ঈমান আর মুসলিম পরিচিতি বিক্রি করেছেন?

মৌলবাদ ও অমৌলবাদীদের কোরআনী উপমা

মৌল ও অমৌল-এর চমৎকার একটি তুলনা রয়েছে পাক কালাম আল-কোরআনে। সেটি হচ্ছে কালেমায়ে তাইয়্যেবা আর কালেমায়ে খাবিছার উপমা। কালেমায়ে তাইয়্যেবা ইসলামের মৌল ভিত্তি। এই ভিত্তিকে ভিত্তি করে মৌলপন্থীদের সৃষ্টি। কালেমায়ে খাবিছা হচ্ছে ইসলামের বিপরীত তথা অমৌল, যার কোন ভিত্তি নেই। ভিত্তিহীন গাছকে বলে পরগাছা। এই পরাশ্রয়ী মন্দ গাছের মন্দ ছায়ায় যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা অমৌলবাদী। ইসলামে মৌল আর অমৌল-এর মাঝামাঝি স্থানে থাকে শুধু মোনাফেক। মুরতাদরা অমৌলবাদীদের দলভুক্ত হয়ে থাকে শুধু মৌলবাদীদের বিরোধিতার জন্য। কালামে পাকে কালেমা তাইয়্যেবা আর কালেমায়ে খাবিছার উপমাটি এভাবে দেয়া হয়েছেঃ তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তাঁআলা কালেমায়ে তাইয়্যেবা কোন্ বস্তুর সংগে তুলনা করেছেন? কালেমায়ে তাইয়্যেবার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, কালেমায়ে তাইয়্যেবা এমন একটি সৎ বৃক্ষের সমতুল্য, যার শিকড় মৃত্তিকার গভীরে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং শাখাগুলো উর্ধ্বলোকে সম্প্রসারিত। প্রতি

www.pathagar.com

মূহূর্তে তার স্রষ্টার নির্দেশে নিজের ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ এজন্য দিয়েছেন, যেন লোকজন তা থেকে সবক গ্রহণ করতে পারে। কালেমায়ে খাবিছার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, এ যেন একটি অসৎ বৃক্ষ যা মাটির উপরিভাগ থেকে উপড়িয়ে ফেলা যায়, এর কোন দৃঢ়তা নেই। ঈমানদারদের এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর জালেম লোকদের আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহর এখতিয়ার রয়েছে, যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (সূরা ইবরাহীম- ২৪-২৭ আয়াত)

Seest thou not how
Allah sets forth a Parable?-
A Goodly word
like a Goodly tree,
Whose root is firmly fixed,
And its branches (reach)
To the heavens-
It brings forth its fruit
At all times by the leave
of its lord,
so Allah sets forth Parables
for men, in order that
They may receive admonition.
And the Parable
of an evil word
Is that of an evil tree.
It is torn up by the root
from the surface of the earth:
It has no stability
Allah will establish in strength
Those who believe with the word,
that stands firm, in this world

www.pathagar.com

And in the hereafter; but Allah
will leave, to stray, those
who do wrong: Allah doeth
what He willelth.
Sura Ibrahim 24-27)

মৌলবাদ একটি গালি না আশীর্বাদ?

'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদী' কোন গালির নাম নয় বরং এ হচ্ছে পুরোপুরি আশীর্বাদ বিশেষ। যাদের উদ্দেশ্যে এই শব্দটি গালি হিসাবে বর্ষিত হয়, তাদের কেউ কেউ এ গালি শুনে বড়ই বেজার হন অথবা রাগে লাল হয়ে ওঠেন। এ দ্বারা স্পষ্টই মনে হয় যে, যারা গালি হিসাবে এ শব্দটি উচ্চারণ করেন, তারা যেমন শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝেন না, তেমনি বেজার-হওয়া ভদ্রলোকেরাও বুঝেন না। যারা গালি দেন তারা যদি বুঝতেন যে, এতো আসলে কোন গালি নয় বরং আশীর্বাদ বা এক সার্টিফিকেট, তাহলে তারা কখনো ভুলেও নিজেদের দুশমনকে এ শব্দ দ্বারা সংবর্ধনা জানাতেন না। তারা তখন অন্য কিছু বলতেন। খৃস্টান আর কম্যুনিস্ট দুনিয়াতে এই 'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদীর' সঠিক অর্থ নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তো কোন্ ফেরকার লোক প্রকৃত মৌলবাদী, তা নিয়ে ১৮৭০ সাল থেকে রীতিমত আন্দোলন হয়েছে। ক্যাথলিকরা বলে, তারা মৌলবাদী, প্রোটেস্ট্যান্টরা বলে, তারাই মৌলবাদী। এভাবে ব্যাপটিস্ট, ম্যাথডিস্ট, মিলেনারীয়ান সহ যত ফেরকার খৃস্টান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের দাবিও একই। লেলিন ও এঙ্গেলস নেতৃত্বাধীন রাশিয়ান কমুনিস্টরা বলতো, তারা কম্যুনিজমের মূল ধরে আছে। আদি অকৃত্রিম আর নির্ভেজাল কম্যুনিজম তাদের কাছেই রয়েছে। চীনের মাও সেতুঙ আর চৌ এন লাই-এর দাবিও তাই। তারা চীনের কম্যুনিজমকে বলতেন 'নিখাঁদ'। তাদের মৃত্যুর পর চীনে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে কম্যুনিজম যে অবস্থায় আছে সেটাই নাকি এখন মৌল। ষ্টালিনপন্থীদের দাবি, তারাই 'মৌল' কম্যুনিজম নিয়ে আছেন। পরিতাপের বিষয়, মৌলবাদী হওয়াটা যখন বিশ্বে নিখাঁদ হওয়ার সার্টিফিকেট হিসাবে বিবেচিত, তখন বাংলাদেশে, এক শ্রেণীর মুসলমান ইসলামের মৌলনীতির অনুশীলন ও অনুসরণকারীদের মৌলবাদী বলে গালি দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

মৌলবাদ—অমৌলবাদের শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশে মৌল-অমৌল ইস্যুটি প্রধান দুটি স্রোতধারা সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত মৌলবাদীরা এই মৌলবাদী পরিচিতি (Identity) লাভে ধন্য ও গর্বিত। এক শত্রু অন্য শত্রুকে শত্রু-জ্ঞান করে, শত্রুর মত সম্বোধন করে; কিন্তু কখনো একজন অন্য জনকে 'অকৃত্রিম' ও 'বিশুদ্ধ' বলে না। 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' সব সময়। এটাই স্বাভাবিক আর তা ঘটছেও হরহামেশা। অথচ শত্রুর শত্রুতার নিয়মনীতি লংঘন করে যদি না বুঝে ভুল করে এক প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফাই গেয়ে একটি সত্য কথা বলে ফেলে, তাহলে এ সত্যকে সন্তুষ্ট চিত্তে পরমানন্দে গ্রহণ করা উচিত। শত্রু যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলে বসে 'তুমিই সৎ বৃক্ষের শিকড়, আমি নই' তাহলে সেই শত্রুকে মোবারকবাদ জানানো উচিত। হোক সেটা তার না বুঝার উক্তি, কিন্তু কথাটা যা বললো, তাতো সত্য বললো। আমার ভিত্তিই যে আসল ভিত্তি তথা মৌল, শত্রুর এই সার্টিফিকেট আমার কাছে সাত রাজার ধন। এখন যদি শত্রু তার সত্য ভাষণে পংক নিক্ষেপ করে পংকিল করতে চায়, নিজের ভুল শোধরিয়ে যদি এখন সেই সত্যকে অস্ত্র বানিয়ে আমাকে হামলা করতে চায়, তাহলে তা অচিরেই বুমেরাং হবে নির্ঘাত। 'আমি মূল' একথা বলেও এখন বলছে 'মুলই ভূল'। আমি বলি ওটা তার জন্য ভুল; কিন্তু আমার জন্য সুবাসিত ফুল। একারণে এই ভুল করে দেয়া সার্টিফিকেটেই রয়েছে মৌলবাদীদের আসল পরিচয়। তারা প্রশান্ত চিত্তে এখন বলতে পারেন, 'যাক বাবা, এতদিনে তো শত্রুপক্ষ থেকে অন্তত সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এ স্বকৃতিদ্বারাই দুনিয়াবাসী বুঝুক, কারা মুল ধরে আছে, আর কারা ডালে ডালে বিচরণ করছে।

অমৌলবাদীরা ভুলের গাঙ্গে অবগাহন করে ভুলে আচ্ছন্ন ও আক্রান্ত হয়ে গর্ব করে বলছেন, 'প্রতিনিয়ত আবহাওয়া বদলাচ্ছে, যুগের পরিবর্তন ঘটছে, আমরা শুধু তালে তাল মিলাচ্ছি। দু'দিনের দুনিয়া, নগদ যা পাচ্ছি, বাছ-বিচার না করে হাত পেতে নিচ্ছি, পুরাতনকে পিছনে ফেলে নতুনের কেতন নিয়ে এগিয়ে চলছি, সনাতনকে বর্জন করে আধুনিকতাকে বরণ করছি। আমরা মৌলবাদী নই, এই আমাদের অহংকার'। এই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণী ছাড়া

www.pathagar.com

কমপক্ষে আরো তিনটি শ্রেণী রয়েছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তারাই, যারা মৌলবাদী কি বস্তু তা বুঝেন,কখনো কখনো মৌলবাদী নীতি ও কর্মের অনুশীলনও করেন; কিন্তু প্রকাশ্যে মৌলবাদী বলে দাবি করেন না, আবার মৌলবাদীদের বিরোধিতাও করেন না। কেমন যেন লাজুক লাজুক ভাব, মুখ খুলতে শরম লাগে। অমৌলবাদীদের সমালোচনার শিকার যাতে তারা না হন, সেজন্য গা বাঁচিয়ে চলেন। তারা দু'দিল বান্দা, মোনাফেকও বলা যায়। তাদেরকে দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডলামের সংগেও আলবৎ তুলনা করা যায়। দ্বিতীয় যে শ্রেণীটি রয়েছে, সেই শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা অসংখ্য, এক কথায় যাদের নাম 'জনসাধারণ'। মৌলবাদী-অমৌলবাদী এসব কথা নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামাননা, মাথা ঘামাতেও চাননা এবং কোন পক্ষকে সমর্থন-অসমর্থনের পরোয়াও করেন না। তৃতীয় শ্রেণীতে তারা পড়েন, যারা বুঝদার ও এলেমদার অথচ দুর্বোধ্য চরিত্রের মানুষ। তারা লেবাসে আর মৌল নীতির অনুশীলনে আসল মৌলবাদীদের অনুরূপ; কিন্তু চরিত্র তাদের পঞ্চমবাহিনীর মত। প্রকাশ্য মৌলবাদীদের থেকে তারা থাকে নিরাপদ দূরত্বে আবার অমৌলবাদীদের সংগেও খুব একটা মেলামেশাও করেন না। কিন্তু অমৌলবাদী ও মৌলবাদীদের সংগে যখন ফাইট-ফাইটিং শুরু হয়, তখন অমৌলবাদীদের আংগিনায় তারা ঘুরঘুর করেন। এমনকি ওদের সুনজরে থাকার জন্য প্রয়োজনে অমৌলবাদীদের হয়ে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া আর বিবৃতিও ঝাড়েন। ভীরু হৃদয়ের কাপুরুষোচিত চরিত্র তাদের। স্বজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তাদের জুড়ি নেই, কিন্তু দুরাচারদের বিরুদ্ধে তারা থাকেন একেবারে চুপচাপ।

'মৌলবাদ মানে মূলা'

এই মৌলবাদ বা মৌলবাদী প্রসঙ্গটি বেশ কিছু দিন থেকে শিক্ষিত জনদের মুখে মুখে, পক্ষে ও বিপক্ষে। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্টাইলে ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। বিভিন্ন বৈঠকী আলোচনায়ও মৌলবাদ বেশ গুরুত্ব সহকারে গরম গরম আলোচিত হচ্ছে। কিছু দিন আগে এই রাজধানী ঢাকার এক বাসায় ঘরোয়া খোশ গল্পের এক মজলিসে 'মৌলবাদ' প্রসঙ্গটি আলোচনায় এসে যায়। মৌলবাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা অনেক ব্যাখ্যা মজলিসকে গরম করে তোলে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে থাকেন, কিন্তু মজলিসের প্রবীণতম ব্যক্তিটি শুধু শুনছেন আর শুনছেন, কোন কথা বলছেন না। প্রত্যেকেই চান, তিনি যেন

www.pathagar.com

মৌলবাদ সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেন। সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি মুখ খুললেন। খানিকটা কেশে, গলা ঝেড়ে, মুচকি হাসি দিয়ে মাথা তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'আমি মৌলবাদ বলতে বুঝি মূলা। যে মূলা আমরা উৎপন্ন করি, তরকারি হিসাবে খাই'। একথা বলেই তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এক খানা পত্রিকা হাতে নিয়ে তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন। প্রত্যেকেই বিস্মিত। প্রত্যেকের কাছে মূলা আর মৌলবাদ দুর্বোধ্যই ঠেকলো। মজলিসের এক তরুণ সদস্য ঐ প্রবীণ ব্যক্তির নাতি-সম্পর্কীয়। নাতি জিজ্ঞেস করলেন, 'নানা, আপনার থিওরী কিন্তু আমরা বুঝলাম না। মূলা কিভাবে মৌলবাদ হয়, একটু বুঝিয়ে বলুন'। প্রবীণ ব্যক্তিটি আবার একই ভাবে কেশে-হেসে বললেন, এ আবার না বুঝার তো কোন কারণ দেখি না, যাক শোন, ব্যঞ্জনের উপকরণ মূলার মূলটিই তো মূলা। মূলার মূল ফেলে দিলে থাকে পাতা। এই পাতা গরু ছাগলে খায়। মূলার মূলেরই মূল্য আছে বলে মূলের এত কদর। সকলে এই মূলটাই কিনে। শোন নাতি, বাজার থেকে মূলা কিনে মূলার মূল ফেলে দিয়ে যদি পাতা নিয়ে বাসায় যাও আর গিন্নীকে বল 'এই নাও মূলা', তাহলে তোমার কপালে ঝাঁটার বাড়ি ছাড়া আর কিছু জুটবে না। মূল নিয়েই যেমন মূলা, ঠিক তেমনি দ্বীন-ধর্মের মূল নিয়ে যারা আছে, তারাই মৌল; কিন্তু তোমরা বলে থাক মৌলবাদী। দ্বীন-ধর্মের মৌল অংশ বাদ দিলে যা থাকে, তা মূলার পাতার মত ফেলনা। প্রবীণ ব্যক্তির এই ব্যাখ্যার পর আলোচনা আর আগে বাড়েনি। মজলিসের দু'একজনের কথার ধাচে যদিও বিরোধিতার আমেজ ছিল, কিন্তু প্রবীণের ব্যাখ্যা শুনে তারা মূল ছেড়ে গরু-ছাগলের অংশ নিয়ে কেটে পড়েন।

প্রবীণ ব্যক্তির এই মূলার উপমায় রসিকতার আমেজ আছে, হয়তো কেউ কেউ এই উপমায় কৌতুকেরও উপকরণ আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু 'ফালতু বা বাজে' বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। মূলা আর মূলার পাতার সংগে মৌলবাদী আর অমৌলবাদীর যে তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত চমৎকার ও যথোপযুক্ত উপমা বলে আমি মনে করি। এই বাংলা মূলার ইংরেজী নাম Radish. এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমাকে আরো বেশী বিস্মিত করেছে। রেডিশ-এর সংজ্ঞা হলো এইঃ A kind of plant with edible red or white root অর্থাৎ

www.pathagar.com

লাল বা সাদা মুল বিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ, যা আমরা খাদ্য হিসাবে ভোগ করি। ইংরেজী Radish, ইতালী শব্দ Radice, ফরাসী শব্দ Radis এবং ল্যাটিন শব্দ Radix -এসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে Root অর্থাৎ মূল বা শিকড়। এজন্যই Radish, Radice, Radis এবং Radix শব্দের Root একই স্থানে প্রোথিত এবং একই উৎস থেকে রস আহরিত। মূলার মূলে ইংরেজীতে যা, ফরাসী, ইতালী ও ল্যাটিনেও তা। সুতরাং মূলার মূলের সংগে মৌলবাদের মৌল অংশের অর্থগত ও ভাবগত অপূর্ব সাযুজ্য রয়েছে।

মূল ছাড়া মৌল হয় না। মূল থেকে মৌল। ব্যাকরণে মূল হচ্ছে বিশেষ্য আর মৌল বিশেষণ। প্রথমটি যদি হয় ভিত্তি, তাহলে দ্বিতীয়টি তার সৌষ্ঠব। সৌসাদৃশ্য যেন সোনায় সোহাগা। ইংরেজীতে মূলকে বলে Root, Origin, Foundation এবং মৌল হচ্ছে originating from the root, radical, original, Primary, Fundamental, basic, এখন মৌল-বিরোধীরা চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, কার ভিত্তি কোথায় আর কত গভীর ও সুদৃঢ়, গোড়ায় দখল কার আর আগায় অবস্থানই বা কার। Root নিয়ে থাকবেন, না Rootless পরাশ্রয়ী হয়ে বাঁচবেন? Original থাকাটাই বেশী পছন্দ, না Adulterated (ভেজাল) হওয়াই বেশী কাম্য? ডুরী কাটা ঘুড্ডি হয়ে বাতাসে ভাসবেন, কাক-চিলের ঠোকর খাবেন, না মাটিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির হস্তমূলের নাটাইর সংগে সংযুক্ত থেকে সহি-সালামতে সঠিক ও অরিজিনাল জায়গায় ফিরে আসবেন? Foundation থাকলেই তো Fundamental হওয়া যায়। যাদের চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের Foundation নেই, তারা তো বাজারী মিয়া ভাই, যে ডাকে তার জবাব দেয়া চাই। মৌল শিক্ষা যার মধ্যে নেই, তার হাতে দামী কিতাব এভাবে শোভা পায়, যে ভাবে গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা শোভা পায়। Basic pay বা মূল বেতন তো আসল। মৌল বেতন নির্ধারিত না হলে নিয়োগপত্র দেয়া হয় না, ওভার টাইমের হিসাব কষা যায় না, বোনাস গ্রাচুয়িটী ভাগ্যে জুটে না এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও মাসে মাসে জমা হয় না। হ্যাঁ, মৌল বেতন ছাড়া তারাই চাকরি করতে পারে, যারা বেতন ছাড়া 'ফাও' আয় দিয়ে দিন চালাতে পারে। যে গাছের মুলোচ্ছেদন করা হয়, সে গাছ ভুতলে লুটিয়ে পড়ে। চিন্তা, আদর্শ ও

www.pathagar.com

চরিত্রের শিকড়হীন মানুষ পরের চিন্তা, আদর্শ ও চরিত্র ধারণ করে পরাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকে। কারণ তাদের ভিত্তি নেই।

আভিধানিক অর্থে আমরা ছিন্নমূল বলি তাদের, যাদের জীবন-ভিত্তি বা মূল নেই। ব্যবহারিক অর্থে তাদেরকে বলি ছিন্নমূল, যাদের নেই ঘরবাড়ী, জমিজিরাত অর্থাৎ ঠিকানাবিহীন মানুষের কাফেলা। পরগাছা তাদেরকে বলি, যাদের শিকড় মাটিতে নেই, অন্য গাছের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে। সন্তানের মূল হচ্ছে তার মা-বাবা, যাদের বিয়ে হয়েছে ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলনীতির ভিত্তিতে। এতটুকু ব্যবস্থা সন্তানের জন্মের মূলে না থাকলে সে সন্তানকে জারজ সন্তান না বলে পারা যায় না। আমার মা-বাবার বিবাহ তো ইসলামের মৌলনীতির ভিত্তিতেই সম্পাদিত। আমি আগাগোড়া অমৌল থাকলে মা-বাবার মৌল বিবাহকেও গ্রহণ করতে পারি না। যদি তা না করি, তাহলে আমার দশাটা কি দাঁড়ায়?

ইসলামের মৌলবাদ অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদ থেকে পৃথক

কর্মে ও বিশ্বাসে যারা যে আদর্শের মৌল নীতি মানেন, তারা সে আদর্শের মৌলবাদী। এমনি ভাবে যে ধর্মের মৌল নীতি যাদের বিশ্বাসে ও কর্মে প্রতিফলিত, তারা ঐ ধর্মের মৌলবাদী। একই নীতি ইসলামের মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তবে প্রয়োগগত ফারাক আছে যথেষ্ট। ফারাকটা খুবই মৌলিক। ইসলাম ছাড়াও পৃথিবীতে বেশ কতকগুলো ধর্ম আছে, মতবাদ তো আছে অসংখ্য। একমাত্র ইসলাম ছাড়া সব ধর্মের আর মতবাদের মৌলবাদী হওয়া যায় কতিপয় মৌল নীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং কিছু অনুশীলন করে। তাদের প্রার্থনালয়ের আংগিনার চৌহদ্দিতে স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কিছু অনুশীলন করাই মৌলবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মৌল নীতির প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজন পড়ে না এবং সে ব্যবস্থাও তাদের ধর্মে ও মতবাদে নেই। ইসলামের মৌলবাদী এই সীমাবদ্ধ ছকের অনুশীলন দ্বারা হওয়া যায় না। জীবনের প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে মৌল ও অমৌল নীতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে বা ঘটাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলামের মৌলবাদীদের সংগে

www.pathagar.com

অমৌলবাদীদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। অমৌলবাদীরা বড়জোর এই মৌলনীতি আমৃত্যু ব্যক্তিতে কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়, ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির কিন্তু ঘোর বিরোধী। ইবাদতের বন্দীত্বই অমৌলবাদীদের একমাত্র পছন্দ, ইবাদতের স্বাধীন অনুশীলন তাদের কাছে একেবারে না-পছন্দ। তারা চায় অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদীদের মত ইসলামের মৌলবাদীরা সীমাবদ্ধ চৌহদ্দিতে জীবন যাপন করুক। কিন্তু তারা জানে না, ইসলামের মৌলবাদী আর অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদীদের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। ইসলামের মৌলবাদী হতে হলে ইসলামের মৌল নীতিতে তো অবশ্যই ঈমান ও আমল থাকতে হবে; অধিকন্তু অপরকেও সেই নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, প্রভাবিত করতে হবে এবং একই নীতির ভিত্তিতে সম-মনাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আল্লাহর হুকুম-আহকাম আর রসুল (সঃ আঃ) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে। যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের বিরোধিতার অসারতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। ঐকমত্যে আনতে হবে, সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চূড়ান্ত লক্ষ্য সামনে নিয়ে জীবন-পণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। শহীদ অথবা গাযী, মক্কের সাধন অথবা শরীরপাতন, এই দুয়ের মাঝামাঝি সাচ্চা মৌলবাদীদের কোন মনযিল নেই। ইসলামের মৌলবাদ আর অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদের মধ্যে এই হচ্ছে মূল তফাৎ। এজন্য অন্য ধর্মের মৌলবাদীরাও ইসলামের মৌলবাদীদের বরদাশত করতে পারে না, যেমন পারে না মুসলিম নামের অমৌলবাদীরা।

মুসলিম নামের অমৌলবাদীদের স্বরূপ

পূর্বেই বলেছি, ইসলামের মৌলনীতির যারা অনুসারী নয়, তারা মুসলমান হয়েও মৌলবাদী নয়। ইসলামের 'মাষ্টার রোলে' নাম আছে বটে, কিন্তু বেসিক তাদের কনফার্ম নয়। 'নো ওয়ার্ক নো পে' বেসিজে কেতাবে শুধু তারা আছে, সুবিধা মত অন্য জায়াগায়ও কামলা খাটে। মাঝে মাঝে হাজিরা দিয়ে রেজিষ্টিতে নামটা শুধু তাজা রাখে। তারা খুব ধূর্ত। ঈদে-মিলাদে, শবেকদরে-শবেবরাতে, উরসে-জিকিরে, ধর্মীয় মাহফিলে আর জুমার নামাযে লম্বা পাঞ্জাবী-সদরিয়া আর গোলটুপি পরে তাঁরা ইসলামের মহিমা প্রচার করেন এবং আবেগে আপ্লুত হয়ে ইসলামের জন্য জান-কোরবানের বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণও করেন।

www.pathagar.com

শ্রোতাদের রীতিমত চমকিয়ে দেন। আবার ভিন্ন আয়োজনের ভিন্ন মাহফিলে তারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের 'সাম্প্রদায়িক', 'মৌলবাদী', 'ধর্মান্ধ' ইত্যাদি গালি দেন এবং উৎখাত আর নির্মূলের জন্য উপস্থিত ও অনুপস্থিত শ্রোতাদের প্রত্যক্ষ উসকানি দেন।

তারা কোন্ কথার আর কোন্ আমলের মানুষ তা আমি বুঝি না। নাচের আসরে তারা নাচেন, গানের আসরে তারা গান করেন, ইসলামী মাহফিলে ইসলামের জন্যও কাঁদেন। আল্লাহকে খুশি রাখার চেষ্টাও করেন, ওদিকে শয়তানকেও বেজার করতে পছন্দ করেন না। স্টাণ্ডার্ড মোনাফেকী বোধহয় একেই বলে। আধুনিক পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় 'ডবল স্টাণ্ডার্ড' মানুষ।

এক মহিলা সংস্থার কয়েকজন মহিলা প্রায়ই সংবাদপত্রে বিবৃতি ঝাড়েন। বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'নারী স্বাধীনতা ও পর্দা'। তারা দাবী করেন, "আমরা মধ্যযুগের পর্দা মানি না। মৌলবাদীরা চায় বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যযুগের অবরুদ্ধ জীবনে ঠেলে দিতে"। 'মধ্যযুগ' বলতে তারা ইসলামের সেই সোনালী যুগকে বুঝেন আর মৌলবাদী বলতে বুঝেন ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের। পর্দা মেনে চলাকে তারা অবরুদ্ধ জীবনে ফিরে যাওয়া বুঝেন। ইসলামের মৌল জীবন ধারায় প্রত্যাবর্তনে তাদের প্রবল অনীহার প্রমাণ পাওয়া যায় পেট-পিঠ উদাম করা দেহ আর স্লিভলেস ব্লাউজ পরার স্টাইলে। তবে বাঘিনীর নখের মত তাদের রাঙা নখগুলো দেখলে মনে হয়, সবে মাত্র আদিম যুগের গুহা জীবন থেকে শিকার ধরে নখগুলো রক্তে লাল করে আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছেন। তারা বলছেন, মধ্যযুগের পর্দা তারা মানেন না। ভাল কথা, মধ্যযুগের পর্দা পছন্দ না হলে আধুনিক পর্দাই তারা ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু পর্দা তো অবশ্যই লাগবে, নেংটা তো থাকা যায় না। 'পর্দা মানি না' বলে যারা বেপর্দা থাকতে চান, তারাও যে অজ্ঞাতে পর্দা মানছেন, তা তাদের দেহের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। নিজ নিজ দেহ পরিপূর্ণভাবে পর্দা দিয়ে তারা না ঢাকলেও অন্তত দেহের অধিকাংশ স্থান তো ঢেকে রাখেন তা স্পষ্ট দেখা যায়। নৈতিকতার তাগিদে না হলেও নিরাপত্তার খাতিরে তো বটেই। দেহের যে অংশ পর্দায় তারা ঢেকে রাখেন, সে অংশ তো পর্দায় অবরুদ্ধ হয়েই থাকে। এতটুকু

www.pathagar.com

যখন তারা করতে পারেন, তখন গলা-মাথাটা 'অবরুদ্ধ' করলে মৌলবাদীরা বোধহয় হৈচৈ কমই করতেন। সুতরাং বলা যায়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, দেহের সিংহভাগ পর্দায় অবরুদ্ধ তো রাখতেই হচ্ছে, এই পর্দা উপরের দিকে মাথা পর্যন্ত টেনে তুললে সব ল্যাঠাই চুকে যায়। যদি তারা বলেন, 'আমাদের দেহের কোন অংশেরই কোন প্রকার পর্দার প্রয়োজনই নেই, তাহলে আমিও বলি, মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের প্রশ্ন উথাপনেরও প্রয়োজন নেই। দিগম্বরী হয়ে গোটা বদনকে অবরুদ্ধমুক্ত করে শুধু হাওয়াই লাগান। তবে মধ্যযুগের আইন-কানুন অস্বীকার করলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, তা ভেবে দেখা দরকার। নির্ঘাত আরেক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হবে। আগেই বলেছি, মধ্যযুগের আইন-কানুনে তাদের মায়েদের আর বাবাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সেই বিবাহ নাকচ করলে নিজেদের জন্মের বৈধতা আর থাকে না এবং নাকচকারিণীদের বিবাহ শাদীও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অতএব সাবধান, 'আমও যাবে, ছালাও যাবে'। ইসলামের পর্দা কখনো অবরুদ্ধ জীবনে ঠেলে দেয় না। যারা বলে, পর্দা মানে অবরুদ্ধ জীবন, তারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামের পর্দা কি বস্তু, তা মোটেই বুঝেন না। ইসলামের পর্দা প্রথা কখনো জেলখানার সেল নয়, চার দেয়ালের মধ্যে বন্দিনী জীবনও নয় অথবা তালাবদ্ধ জেওরাতের কৌটাও নয়, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু নেই শরমের পর্দা ছিন্নকারিণী মাঠ-ময়দানের বার মজার স্বাদ চেটে ফেরা মোহতারামাদের। ইসলামে পর্দা কি জিনিস তা যারা জানেন, তারা পর্দার কথা শুনে আঁৎকে ওঠেন না। যে সব মহিলা পর্দার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা জানেন এবং সেভাবে আমল করেন, তাদের কেউই বন্দিনীর জীবন যাপন করছেন না। প্রতিবাদিনীদের যদি খায়েশ থাকে লেবাসে আর চরিত্রে নেংটা জীবন, পুরুষের সংগে ঠেলা-ধাক্কা দেয়া, আর তা হয় তাদের সিদ্ধান্ত, তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার বলাবলির এখানেই ইতি।

বুদ্ধিজীবী নামে কথিত এক বুদ্ধিমানের সাক্ষাৎকার একটি ম্যাগাজিনে গত বছর পাঠ করেছিলাম। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি মুসলমান, ইসলামের প্রতি আমার অনুরাগ প্রবল, কিন্তু তাই বলে আমি 'মৌলবাদী' নই। তার এই বক্তব্য পাঠ করে আমি তো রীতিমত স্তম্ভিত। ভাবলাম, লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? না, আসলে তার মাথা খারাপ হয়নি। তার সে উক্তি ছিল

www.pathagar.com

আতংক-মুক্তির একটা রক্ষা কবচ মাত্র। তিনি মুসলমানিত্বের দাবি করে আর ইসলামের প্রতি অনুরাগের কথা প্রকাশ করে যেন 'কবিরা গুনাহ' করে ফেলেছিলেন, 'মৌলবাদী না হওয়ার' দাবি করে যেন সেই পাপ-স্খালন করলেন মাত্র। কি হীনমন্যতা! ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয়।

মৌলবাদ-এর সঠিক মর্মার্থ যারা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাদের মধ্যেও দু'চারজন আছেন অদ্ভুত চরিত্রের। তারা তথাকথিত প্রগতিশীলদের কাতারে থাকার জন্য 'মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। আজ থেকে প্রায় ছ'বছর আগে বাংলাদেশে 'মৌলবাদ' শব্দটির ব্যবহার ছিল না। তখন অবশ্য 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি বেশ চালু ছিল, যা আজও আছে। সে সময়ের কোন এক বিশেষ দিনে এক প্রখ্যাত শিল্পীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে রেডিও বাংলাদেশে অনুষ্ঠান চলছিল। সেই মরহুম শিল্পীর সুযোগ্য সন্তান রেডিওতে বাবা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আমার আব্বা একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।" তার এই মন্তব্য শুনে মনে হলো যে, তিনিও পিতাকে 'নিষ্ঠাবান মুসলমান' হিসাবে পরিচয় দিয়ে যেন ভুল করে ফেলেছিলেন, তাই তৎক্ষণাৎ পিতাকে অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা করে প্রগতিবাদীদের হামলা থেকে রক্ষা করলেন। ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম নয় আর মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের নামও নয়। এই সত্যটি বিখ্যাত বাবার বিখ্যাত পুত্রধন যদি বুঝতেন, তাহলে বোধহয় অকারণে অযাচিতভাবে এই বাক্যটি উচ্চারণ করতেন না। পুত্রধন পাক্কা নামাযী মানুষ। কিন্তু একটা ভয় বোধহয় তাকে তাড়া করেছিল যে, প্রগতিবাদীদের সমালোচনার শিকার হয়ে পড়েন কিনা। এজন্য মরহুম আব্বাকে অসাম্প্রদায়িক বানিয়ে আধুনিকতার কাতারে দাঁড় করালেন।

বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিনের সম্পাদক একবার মজলুম জননেতা মরহুম মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করেন, "মাওলানা ভাসানী ইসলামের অনেক খেদমত করেছেন; কিন্তু তিনি মৌলবাদী ছিলেন না।" এখানেও দেখা যাচ্ছে ঐ 'কিন্তু'। মাওলানা ভাসানী কি ছিলেন আর কি ছিলেন না, তা

www.pathagar.com

সকলেই কম-বেশী জানেন। সম্পাদক সাহেবের মন্তব্য মোতাবেক একথা তো বলা যায় যে, মাওলানা ভাসানী ইসলামের মৌল নীতি মানতেন না।

মৌলবাদী না হওয়া আর মৌল নীতি না মানা তো একই কথা, ব্যাকরণ অন্তত তাই বলে। সম্পাদক সাহেবের মন্তব্য সঠিক কিনা তা তিনিই ভাল জানেন, তবে এখানে লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে সম্পাদকের মৌল-জ্ঞানের সীমাহীন দীনতা। আজকাল এভাবে অনেকে ইসলামের নাম উচ্চারণ করে ইসলামের প্রতি আলগা আনুগত্যের প্রলেপ লাগিয়ে ইসলামের 'মৌল' দিককে 'অমৌল' হাতিয়ার দিয়ে মুলোৎপাটন করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশের মুসলিম নামের অমৌলবাদীদের এই হচ্ছে স্বরূপ। অজ্ঞতা, ভীরুতা, দুর্বলতা, কূপমন্ডুকতা ও অপসংস্কৃতির দাস্যতার কারণে তারা এমন ভূমিকা পালন করতে পারেন।

'মৌলবাদীদের ঠেকানোর জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'

৭ই জুন (১৯৮৮) মঙ্গলবার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা সম্বলিত সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল দুটি সাধারণ সংশোধনী সহ ২৫৪-০ ভোটে পাস হয়। বিলটি ভোটে দেয়ার পূর্বে রাত ৭-২২ মিনিটে বিরোধীদলের অধিকাংশ সদস্য ওয়াক আউট করেন। বিল পাসের সময় প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সংসদ ভবনে তাঁর নিজস্ব গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন। ফ্রিডম পার্টির সদস্য, স্বতন্ত্র সদস্যগণ এবং কপের জনাব নূরুজ্জামান সহ মোট ১৫ জন সদস্য ওয়াক আউটে অংশ নেননি বরং তারা বিলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। এই সংশোধনী বিলের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন,"আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ৮ম সংশোধনী বিল বাতিল করবে। এই বিল পাস হওয়ার ফলে মৌলবাদীদেরই সুবিধা হলো"। বিএনপি চেয়ারম্যান ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "সংবিধানের ৮ম সংশোধনী সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতিকে বিভক্ত করার সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।" জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, "ইসলামের দরদে নয়, বরং গদি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যেই ৮ম সংশোধনী আনা হয়েছে।"

www.pathagar.com

এই বিল বাতিলের জন্য ৬ই জুন ১৬টি ছাত্র সংগঠন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং ৭ই জুন থেকে ১৩ই জুন প্রতিরোধ সপ্তাহ পালিত হয়। ৫ দল বিক্ষোভ মিছিল করে। ৮ই জুন ছাত্র সংগঠনগুলো ৮ম সংশোধনী বিল পাস হওয়ার প্রতিবাদে ১১টি গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। সরকারী দল এই হাল-অবস্থা দেখে খুবই বিব্রত বোধ করেন। সংশোধনী বিলের উগ্র সমালোচক ও প্রতিবাদকারীদের আশ্বস্ত করার দায়িত্ব নেন প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ। তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিবাদীদের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে এক আবেগময় মুহূর্তে তিনি হঠাৎ আসল কথা বলে ফেলেন। সেই আসল কথাটি ছিল এই- "ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে মৌলবাদীদের ঠেকানোর জন্য"। তাঁর সেই ঘোষণার তাৎপর্য যারা বুঝবার তারা বুঝলেন। কিন্তু অনেকেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। 'মৌলবাদ ঠেকানোর' ঘোষণার পর দেখা যায়, অমৌলবাদীদের তৎপরতা কমে গেছে; কিন্তু মৌলবাদীদের উপর হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

'মৌলবাদকে ঠেকানোর জন্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক দুটি অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে অনেকেই বুঝলেন। তারা বললেন, এ দ্বারা মন্ত্রী মহোদয় যেন বলতে চান বা বুঝাতে চান "হে মাননীয়া নেত্রীদ্বয়, অমৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং অমৌলবাদী রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধেয় সদস্যগণ, আপনারা উত্তেজিত ও হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা কি উদ্দেশ্যে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করেছি, তার পরিচয় আর প্রমাণ পাবেন কিছুদিন পরই। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনাদের জন্যই আমরা এমন করেছি, আমরা তো আপনাদেরই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হলে এমনই করতে হয়। মৌল ইসলামকে অমৌল ইসলাম দিয়েই ঠেকাতে হয়। সে কাজটাই আমরা করেছি। আপনারা অপেক্ষা করুন আর দেখুন আমরা কি করি।

কেউ কেউ বুঝলেন এইঃ মৌলবাদীদের সংখ্যা বাড়ছে আর বাড়ছে। ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। মৌলবাদীদের দিকে পাবলিক কিন্তু ঝুঁকে পড়ছে। এভাবে মৌলবাদীদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে অমৌলবাদীদের বিপদ। এজন্য তাদের অবশ্যই ঠেকাতে হয়, কিন্তু উপায় কি? উপায়টা সরকারই বের

www.pathagar.com

করলেন। সেই উপায় হচ্ছে এইঃ 'মৌলবাদীদের ইসলাম ঠেকাতে হলে আগে পাবলিককে বুঝতে দিতে হবে যে, সরকার কখনো ইসলাম বিরোধী নয়। তাই সর্বাগ্রে রাষ্ট্রধর্মের খালি সাইন বোর্ডে লিখে নিতে হবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কথাটি। তখন পাবলিক মনে করবে যে, সরকার মৌলবাদীদের ঠেঙ্গাচ্ছে ইসলামের জন্য নয়, হয়তো অন্য কোন কারণে। কারণ খোদ প্রেসিডেন্ট তো প্রতি জুমায় কোন না কোন মসজিদে ইসলামের ওপর বক্তব্য রাখেন। তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছেন, শুক্রবার ছুটি ঘোষণা করেছেন। আর কি চাই? ইসলামের তো অনেকই হয়ে গেল।

মৌলবাদ ঠেকানোর জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার এসব তাৎক্ষণিক অর্থ করছেন ওয়াকেফহাল মহল। এই ঘোষণার নেপথ্য উদ্দেশ্য তা হতে পারে বলে আমারও ধারণা। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে তথ্য বহুল চমৎকার একটি বক্তৃতার মধ্যে হঠাৎ 'মৌলবাদ ঠেকানোর' টেক্কুর উঠবার কারণটা কি হতেপারে?

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় 'ঠেকানোর ঘোষণা' শুনে আমি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ বুঝতে পারিনি এ ঘোষণার গুঢ় রহস্য কি? আমি ভাবতে লাগলাম যে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দ্বারা ইসলামের মৌল নীতিগুলোই তো বাস্তবায়নের নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি হলো। এই সুবাদে মৌলবাদীদের বরং আরো সুবিধা হওয়ারই কথা। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় বলছেন উল্টো কথা। তাহলে অষ্টম সংশোধনীর ইসলাম কি অন্য কোন ইসলাম? সে ইসলাম কি মৌল নীতি বিবর্জিত? সে ইসলামে আল্লাহ আর আল্লাহর রসূলের ফরয ওয়াজেব কি নেই? নামায-রোযা কি হবে ঐচ্ছিক এবাদত? আমার মনে দারুণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। তারপর ধীরে ধীরে সংশয়ের কুয়াশা কাটলো। সাইন বোর্ডে ইসলামকে ব্যবহারের গরজটা যে কি, তা বুঝতে শুরু করলাম। আরো বুঝলাম, ইসলাম ব্যবহারের গরজ ছিল যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়েও বেশী ছিল কূটনৈতিক। ঈমানী গরজ কি পরিমাণ এর মধ্যে ছিল, তা আল্লাহই ভাল জানেন। কেউ কেউ তো এ মন্তব্যও করেন যে, মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুবিধাবাদী মতলবী ইসলাম দিয়ে মৌল ইসলাম বিতাড়ন, নামসর্বস্ব ইসলাম

www.pathagar.com

দিয়ে মৌল ইসলামের মুলোৎপাটন, ফরয-ওয়াজীবকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিবর্তন, আল্লাহর বিধান আর রসুলের আদর্শের সংগে যুগের হাওয়ার কোয়ালিশন এবং ওহী ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতির সাথে ওয়াশিংটন- মথুরা-মস্কো সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সাধন।

একটা বিশাল বটবৃক্ষের কথা ধরা যাক। দূর থেকে তাকালে প্রথমে এই বট বৃক্ষের কাণ্ড নজরে আসার আগে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব নজরে আসে। মৌল অংশ থাকে দৃষ্টির আড়ালে আর অমৌল অংশ চলে আসে দৃষ্টি সীমানায়। পৃথিবী গোলাকারের প্রমাণে যেমন দূর থেকে জাহাজের বডি দেখার আগে মাস্তুল দেখা যায়। পাতা রাখে কাণ্ডকে আড়াল করে, তাই গোড়া দেখা যায় না। দূর থেকে বৃক্ষের আগা আর গোড়া দৃশ্যমান হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়মকে রাজনীতির কৃত্রিম থিওরীতে রূপান্তর ঘটিয়ে সরকার বিশ্ববাসীর চোখে একটা ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা করেন। মৌল ইসলাম-বৃক্ষের কাণ্ড যাতে লোক চক্ষুর আড়ালে থাকে, সে জন্য মৌল ইসলামকে অমৌলের ঝোপ-জঙ্গল দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সাইন বোর্ডের আড়ালে দোকানের অভ্যন্তরে মালপত্তর থাক্ আর না থাক্, এত খোঁজখবর নেয় কে? ওয়াশিংটন-মস্কো-মথুরা তো খুশি, মুসলিম দেশগুলোও সাইন বোর্ড দেখেই খুশিতে বাগবাগ। এর অধিক আর কি চাই?

অমৌলবাদী ইসলাম মানে সুবিধাবাদী ইসলাম। মসজিদে যাওয়া যায়, ক্লাবেও নাচানাচি করা যায়। মিলাদে গোলাপ পানি ছিটানো যায় আর পার্টিতে মদও গিলা যায়। অপূর্ব সমন্বয়! জমজমাট আপোসের কারবার। অমৌল তথা সুবিধাবাদী ইসলামে দিব্যি চলতে পারে মদ তৈরী, মদ আমদানী, বেশ্যাদের কানুনী রেজিষ্ট্রী, বেশ্যাখানার লালন-পালন ও পোষণ, বেশ্যা শিল্পের সম্প্রসারণ, সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা, ইনসাফ-বিচারের কেনা-বেচা এবং আরো কত কিছু। স্বার্থের ঠুলিপরা সুবিধাবাদী সেক্যুলারপন্থী এলেমদার দিয়ে বহু আকাম-কুকাম জায়েয করেও নেয়া যায়। তাদের লেলিয়ে দিয়ে মৌলবাদীদের উদ্দেশ্যে ভেউ ভেউ করানো যায়। সস্তা মূল্যে তাদের থেকে ফতোয়া কিনে বা উপহার হিসাবে সংগ্রহ করে

www.pathagar.com

সে সব ফতোয়াকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে রাজনীতির ময়দানের সেক্যুলারপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের সহায়তায় কোরআনের তাফসীর মাহফিল পর্যন্ত বন্ধ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনবোধে পাল্টা তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করে দেশবাসী ও দুনিয়াবাসীকে বলে দেয়াও সম্ভব হয় যে, সরকার প্রকৃত পক্ষে তাফসীর মাহফিলের বিরোধী নয়। 'মৌলবাদ ঠেকানোর ইসলাম'-এর মহিমা এমনই যে, 'মৌলবাদীদের ইসলাম সঠিক নয়, ইসলামের অপ-ব্যাখ্যার নামান্তর', এই সার্টিফিকেট সেক্যুলার ও সমাজতন্ত্রীরাও দিতে পারে। সাথে তো রয়েছেন লিল্লাখোর এক শ্রেণীর ফতোয়াবাজ এলেমদার। মৌলবাদ ঠেকানোর ইসলামের এমনই মরতবা যে, নাস্তিক ও সেক্যুলাররাও ইসলামের জবর কীর্তন করে। সরকারী ইসলাম বড়ই শক্তিমান ও সম্মোহনী গুণের অধিকারী। এক প্লাটফরমে সেক্যুলার ও সমাজতন্ত্রীদের জড়ো করতে পারে। আল্লাহর দুশমনেরাও কোরআনের ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা নিয়ে বক্তব্য রাখতে পারে। এ সব তেলেসমাতকে কিয়ামতের আলামত ছাড়া আর কি বলবেন? সরকারী বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। ঐক্য পরিকল্পনার সার্থক বাস্তবায়ন, যদিও স্থায়িত্ব সাময়িক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঐক্যের নজির আমার জানা মতে দ্বিতীয়টি নেই। ধুরন্ধর সমাজতন্ত্রী, মোনাফেক, সেক্যুলার, লিল্লাহখোর আস্তিক এলেমদার এক কাতারে এক বর্তনে আহার করছেন। প্রধানমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ এভাবেই যে মৌলবাদকে ঠেকাবেন, তা মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনার পর আমি এই রহস্য বুঝতে পারিনি। 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার' রহস্য উদঘাটন করেছি অনেক পরে। হয়তো আমার অজানা আরো কোন ঘনীভূত রহস্যও থাকতে পারে। আমার আর একটি বিশ্বাস এই যে, অষ্টম সংশোধনীর যে সুবিধাবাদী ইসলাম দিয়ে মৌল ইসলামকে তাড়াবার চেষ্টা চলেছে, তা আজ হোক কাল হোক ইনশাআল্লাহ ব্যর্থ হবেই। একদিন এই সংশোধনী মৌলবাদীদের জন্য শাপে বর হবে। এটা ভারতের বুঝদাররা বুঝেছেন, এ জন্য তারা আনন্দবাজার ও যুগান্তরের মাধ্যমে চীৎকার শুরু করেছেন। এমনকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমারাও এবং অধ্যাপক সমরগুহের মত লোকও শংকিত হয়ে পড়েছেন। তারা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগসহ সেক্যুলার দলগুলোর উপর জোর ভরসা করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন. দেখা যাক বঙ্গবদরা কি করে।

www.pathagar.com

"বাংলাদেশে মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধি বিপজ্জনক"

—বলেছেন ভারতের পি, ভি নরসীমা রাও

V. [illegible]

विदेश मंत्री
भारत
EXTERNAL AFFAIRS MINISTER
INDIA

NEW DELHI - 110011.

October 19, 1988

Dear Prof. Guha,

I have received your letter of August 26, 1988. I share your anguish at the fact that those affected by the Partition continue to pay the price, for no fault of theirs.

2. We are deeply concerned at the dangerous growth of religious fundamentalism in our neighbourhood which endanger minority communities. In our public statements and in our contacts with the Bangladesh Government, we have made it clear that while we accept that this is an internal affair of Bangladesh, we consider it Bangladesh's responsibility to ensure that the minorities do not feel insecure. If there is an exodus of the minorities across the border, India becomes an affected party and the matter can no longer be considered a purely domestic affair of Bangladesh. We believe the Bangladesh Government is fully aware of our views.

3. Meanwhile, I do believe that the focussing of public opinion on such issues by enlightened persons like you has an important role in bringing home to the concerned authorities that Indian public opinion will not accept suppression of the rights of minorities anywhere.

With kind regards,

Yours sincerely,

P.V. Narasimha

(P.V. Narasimha Rao)

Prof. S. Guha

www.pathagar.com

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ পি, ভি, নরসীমা রাও বলেছেন, বাংলাদেশে মৌলবাদের 'বিপজ্জনক' শক্তি বৃদ্ধির ফলে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পর প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রথমবারের মত ভারত সফরের প্রাক্কালে গত ২৭শে সেপ্টেবর ১৯৮৮ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে প্রেরিত সাবেক এম পি সমরগুহের একটি চিঠির জবাবে ১৯শে অক্টোবর মিঃ নরসীমা রাও এ কথা বলেন। কোলকাতা থেকে পাঠানো এক পত্রে মিঃ সমরগুহ বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নাগরিক সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।. ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া অমুসলিমদের জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে। বাংলাদেশ হবার পর ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে জাতীয় মুলনীতি ঘোষণা করার মধ্যদিয়ে সব ধর্মের মানুষের সমান মর্যাদা, দায়িত্ব, অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মৌলবাদীরা এখন বহুমুখী জাল বিস্তার করে এসব মুলনীতি ধ্বংসের প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা সংখ্যলঘুদের মধ্যে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায়। দীর্ঘ পত্রে মিঃ গুহ উল্লেখ করেন, সুখের বিষয় হল, আওয়ামী লীগসহ সেক্যুলার দলগুলো বাংলাদেশে ইসলামীকরণ ও মৌলবাদীদের বিরোধিতা করছে। এই পত্রের উওরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পি, ভি, নরসীমা রাও তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভেই সমর গুহকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, যারা ভারত বিভাগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের বিনা দোষে তার মাশুল এখনো দিতে হচ্ছে বলে আপনার মতো আমিও ক্ষুব্ধ। আমাদের প্রতিবেশী দেশে মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধি সংখ্যালঘুদের জন্যে বিপদ ডেকে আনছে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ভারতের জনগণ কোথাও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনকে বরদাশত করবে না। সংখ্যালঘুরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসলে বিষয়টি আর বাংলাদেশের ঘরোয়া ব্যাপার থাকে না। সেখানে সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সে দেশের সরকারের দায়িত্ব। আমাদের বিশ্বাস, তারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল (দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে 'মৌলবাদ' শব্দটি কি ভাবে কি উদ্দেশ্যে এবং কারা ব্যবহার করছেন এবং কখন কাদের থেকে এশব্দের আমদানী হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের একটি অভিমত এখানে তোলে ধরলাম। তাঁর কোন কোন মন্তব্য হয়তো বিতর্কিত, কিন্তু মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য। মৌলবাদ সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত হচ্ছে এইঃ

"মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কি? একটি ধর্মের মূল আদর্শকে আবিষ্কার করে তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা, এটাই মৌলবাদিতা। এটা তো কোন অপরাধ হতে পারেনা। কোন মানুষ যদি তার ধর্মের মূল আচরণের মধ্যে প্রবেশ করে সেই আচরণকে অবলম্বন করতে চায়, তাহলে তার মধ্যে অপরাধ কোথায়? অপরাধ তখনই হবে, যখন একজন মানুষ তার মৌলবাদের সাহায্যে অন্যকে আক্রমণ করে এবং অন্যের আচরণে প্রতিবাদ উপস্থিত করবে। এটা অবশ্য হতে পারে যে, কখনও কখনও মৌলবাদটা রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় পরিণত হয় এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল সেই প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করে কঠোর ব্যবস্থাপনার ঘোষণা দেয়। আমাদের দেশে সে রকম অবস্থা ঘটেছে কি?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় একটি মৌলবাদী দল যদি তাদের রাজনৈতিক প্রচারে নিযুক্ত থাকে, তবে তার বিরুদ্ধেও তো অন্যদল থাকতে পারে এবং স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারে। মুলত খুব সহজভাবে একটি বিচারে আসার উপায় হিসাবে মৌলবাদ কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ ধর্মের ধর্মীয় নিষ্ঠার কথা বলছেন। এটা একটা নিরীহ বক্তব্য। কিন্তু কেউ তাকে আক্রমণ করে যদি মৌলবাদী বলেন, তাহলে একজনের নিরীহ ধর্ম যাপনের মধ্যে আঘাত করা হলো–একথাই আমরা বলবো। দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধীরাই এই ধরনের আক্রমণ করে থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় আচরণ নিষিদ্ধ নয়। আবার অন্যপক্ষে নাস্তিকতা প্রচার রাষ্ট্রের একটি নির্দেশ। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা নাস্তিকতা প্রচারের পথটাকে সুগম করতে চান মৌলবাদী শব্দটি ব্যবহার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন নাস্তিকতা প্রচার রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা, আমাদের দেশে যদি একই ভাবে ইসলাম প্রচার রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা হতো, তাহলে কি অপরাধ হতো? আমাদের

www.pathagar.com

দেশ কম্যুনিস্ট দেশ নয় এবং এদেশের মানুষ নাস্তিকতাকে কখনো গ্রহণ করবে না। কয়েকজন মাত্র শিখন্ডি যদি নাস্তিক থাকে, তাহলে তাদের চীৎকারে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এখানে মৌলবাদ কথাটি একটি অর্থহীন শব্দ মাত্র। ইসলামে (মৌল আছে কিন্তু) মৌলবাদের কোন সুযোগ নেই। ইসলাম যেহেতু মানুষের সার্বক্ষণিক কর্মসাধন প্রক্রিয়াকে সুন্দর ভাবে এবং সুশৃংখলভাবে গড়ে তুলতে চায়।সুতরাং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের সংগে তুলনা করা চলে না। এদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছিল সুফীদের সাহায্যে। তাঁরা মমতা ও মানবীয়তার সাহায্যে এদেশের মানুষকে মুসলমান করেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধ করেননি, ভালবাসার সাহায্যে মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের বিপক্ষ হিসাবে যখন মুসলমান দণ্ডায়মান হলো, তখনই মুসলমানদের আচরণকে 'মৌলবাদী' বলে আখ্যায়িত করা হলো। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় ভাবে কোন দলের রাজনৈতিক বিপক্ষ নেই। সুতরাং এই অর্থে মৌলবাদ কথা এখানে সম্পূর্ণ অচল।"

বাংলাদেশে 'মৌলবাদ' শব্দের রফতানী

বাংলাদেশে মৌলবাদ শব্দটি রফতানী করে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা। এই দুটি প্রচার মাধ্যম দুটি খৃস্টান দেশের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন হওয়ার কারণে খৃস্টান জগতের ফাণ্ডামেনটালিজম বা মৌলবাদ শব্দটি তাদের কাছে পরিচিত। এ সম্পর্কে খৃস্টান জগতের ফাণ্ডামেনটালিজম বা মৌলবাদ শব্দটি তাদের কাছে পরিচিত। খৃস্টান জগতে 'মৌলবাদ' শীর্ষক আলোচনায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের যে-সব দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে, সে-সব আন্দোলনের খবরাখবরকে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার ভাষ্যকাররা প্রথমে 'মৌলবাদী সংগঠন' বলে পরিচয় দিয়ে সংগঠনের মূল নাম উচ্চারণ করে থাকে। এ ধরনের সংগঠন মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই আছে। যেমন মিসর ও সুদানে এখওয়ানুল মুসলিমীন, তুরস্কের মিল্লি সালামত পার্টি, ইন্দোনেশিয়ার নাহদাতুল উলামা, মাসজুমী পার্টি, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও মালয়েশিয়ার আমকাতান বেলিয়া ইসলাম মালয়েশিয়া (আবিম) ও ইসলামিক পার্টি, ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী। এভাবে বিভিন্ন নামে অনেক মুসলিম দেশে একাধিক

www.pathagar.com

সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের পরিচিতি হচ্ছে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার কাছে 'মৌলবাদী'। খৃস্টান মৌলবাদীদের পরিচিতি প্রচারে এই দুটি প্রচার মাধ্যম সংগঠনের নামই শুধু উচ্চারণ করে, কিন্তু মুসলিম সংগঠনের পরিচিতির বেলায় তীব্র ব্যঙ্গ (Sarcastic) আমেজ তাদের উচ্চারণে আর ভাষ্যে ফুটে ওঠে। লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুকরণ, অনুসরণ, অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সব মুসলিম দেশে ইসলামী সংগঠন রয়েছে, সে সব দেশের অধিকাংশ সরকারই সেক্যুলার হওয়ার কারণে ইসলামী দলের সংগঠন–তৎপরতা বরদাশত করতে পারে না। বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার ও ইসলামপন্থী সংগঠনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে সংগঠনগুলো নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার ভাষ্যকাররা সরকারকে সরকার নামে পরিচয় দিয়ে এসব সংগঠনকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করে খবর পরিবেশন করেন। এই মৌলবাদী শব্দটি বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা প্রচার মাধ্যম দ্বয় বাংলাদেশে শুধু জামায়াতে ইসলামকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করে। ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী নতুন ভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামোতে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াতে ইসলামীর এই পুনরাবির্ভাব যেমন সে সময়ের সরকার সরল মনে গ্রহণ করে নিতে পারেননি, তেমনি বর্তমান সরকারও মেনে নিতে পারছেন না। সেক্যুলারপন্থী ও কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলোর তো এই দলের আবির্ভাবকে বরদাশত করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ একই খাপে একাধিক তলোয়ার থাকতে পারে না। ইসলামপন্থী, সেক্যুলারপন্থী আর কম্যুনিস্ট একমনে একপাতে বসে খেতে পারে না। ইসলামের উত্থান হলে সেক্যুলার ও সমাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য, আবার সেক্যুলারপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের উত্থান ঘটলে ইসলামের গতি শ্লথ হতে বাধ্য। বাংলাদেশে এই তিনের অস্তিত্ব রয়েছে। সেক্যুলারপন্থী আর কমুনিস্টরা 'মাসতুতো' ভাই। ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং মিলই অধিক। সরকারও গদি রক্ষার খাতিরে আর প্রগতিবাদী থাকার স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট কারণে ইসলাম বিরোধীদের দিকেই ঝুকে থাকেন, তাদের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনও বোধ করেন। সুতরাং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শুরুতেই সংঘাতের সম্মুখীন হয়। মিছিলে–মিটিংয়ে হামলার শিকার হয়, ত্রিমুখী

www.pathagar.com

আক্রমণ মোকাবেলা করে পথ চলতে হয়। ফলে এই সংগঠনের অনেককে জীবন দিতে হয়। শত শত জন জখমী হয়ে যন্ত্রনা ভোগ করছে, অংগহানি ঘটে পংগু হয়েছে। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা এই সংঘাত-সংঘর্ষের খবর তখন 'মৌলবাদী সংগঠন' পরিচয়ে পরিবেশন করে। এভাবে শত শত দুর্ঘটনার সংবাদ ও সংগঠনের সাধারণ কর্মকাণ্ডের খবর পরিবেশনে 'মৌলবাদী' বিশেষণটি যোগ করে দুই আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। বাংলাদেশ তো আমদানীপ্রিয় দেশ। এই শব্দটির ব্যবহারকারী দলগুলো আগেই মুখস্থ করে রেখেছিল। প্রয়োগের তেমন সুযোগ আসেনি। ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টিতে তারা ব্যস্ত ছিলেন। সে পরিবেশ তারা কৌশলে সৃষ্টি করেছেন। সরকারী সহযোগিতার আশ্বাস প্রকাশ্যে হাসিল করেছেন। মৌলবাদ শব্দ উচ্চারণে, মৌলবাদীদের উৎপাটনে, বিনা হুকুমে হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়ে নির্মুল অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছেন খোদ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন- প্রধান। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে মৌলবাদী শব্দের রফতানী করেছে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা। আকাশবাণীও সহযোগিতা করেছে এবং এই শব্দটি দ্বারা একমাত্র জামায়াত-শিবিরের গায়ে ছাপ মারছে। এখন মৌলবাদী শব্দযুক্ত সংগঠন বাংলাদেশে কোন্‌টি, তা আর কারো অজানা নেই। সেক্যুলার আর নাস্তিক দলগুলো এবং সরকার এখন একযোগে এক সাথে এই দলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

ইসলামের মূলোৎপাটনে মোস্তফা কামাল

ইসলামের মূলোৎপাটনে তুরস্কের মোস্তফা কামাল ছিলেন বিংশ শতা ব্দীর প্রথম পুরুষ। তাঁর সরকার ছাড়া আর কোন মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তিকে ইতিহাসে এমন ভূমিকায় দেখা যায় নি । অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ)-এর ওফাতের পর ইসলামের মৌল বিধি-বিধান থেকে অনেকেইতো দূরে সরে গেছেন। খলিফা ও ইসলামী রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে তুরস্কের মোস্তফা কামালকে এতবড় বদনামী করা হচ্ছে কেন? উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ, মুসলমান মুসলমানে বহু লড়াই হয়েছে। এজন্য ইসলামের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে; কিন্তু ইসলাম উৎখাতের ঘোষণা দিয়ে কেউ লড়াই করেনি, এমনকি এজিদও নয়। কোন

www.pathagar.com

কোন কৌশলনীতি নিয়ে মতভেদ ঘটেছে, খলিফা নির্বাচন নিয়ে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, কোন কোন খলিফার শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছে এবং আরো অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। সবই ঘটেছে বিভিন্ন ইস্যু, সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতিগত প্রশ্নে।

বিভিন্ন বিবদমান দল বা বিদ্রোহী দল উপদলের অভিমত ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে; এমনকি ইতিহাসে যে সব মুসলিম শাসকের নাম উচ্চারণে আমরা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করি, তারাও অন্তত নাস্তিক ছিলেন না, ইসলামের কোন না কোন নিয়ম-নীতি অনুশীলনের মধ্যে নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। আকবর দ্বীনে এলাহি নামে একটি 'আকবরী মতবাদ' প্রবর্তন করে ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছেন বটে; কিন্তু তাঁর সেই সৃষ্ট মতবাদ গ্রহণে কারো উপর তিনি জুলুম করেন নি এবং নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করেননি। তিনি মাত্র ১৮ জনকে নিজ মতবাদের জন্য সংগ্রহ করে সন্তোষ্ট থাকতে হয়েছে। তিনি তাঁর অর্থমন্ত্রী টোডর মল্লকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারেন নি। কিন্তু মোস্তফা কামাল নিজে নাস্তিক হয়েও চুপ থাকেননি, গোটা তুরস্কের মানুষকে নাস্তিক্যবাদে দীক্ষিত করার কোন প্রচেষ্টা বাদ রাখেননি। এজন্য এ কথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে মোস্তফা কামাল মুসলিম নামের প্রথম নাস্তিক শাসক, যিনি মুসলিম মিল্লাতে মৌলবাদ, ধর্মান্ধ, মধ্যযুগীয় প্রভৃতি গালি ও অপবাদের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। কামালবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম নামধারী সমর্থকরা এজন্য মোস্তফা কামালকে তাদের চিন্তা-চেতনার সংগ্রামী দিশারী বা পথিকৃৎ বলে মনে করে থাকে।

স্বজন যখন দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই দুশমনের চেয়ে ভয়ংকর দুশমন আর কেউ হয়না। রসগোল্লাকে মিষ্টির সেরা বিবেচনা করা হয়। কারণ রসগোল্লা সুস্বাদু, উপাদেয় এবং তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু এই রসগোল্লা পচে গেলে তা হয় ভয়ঙ্কর বিষের চেয়েও অধিকতর ভয়ঙ্কর। যুদ্ধে সম্মুখ শত্রু বড় শত্রু নয়, এমনকি পিছন থেকে ধাবমান শত্রুও নয়, সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে 'পর হয়ে যাওয়া' আপন দলের আপনজন। ইসলামের ভয় নেই ইবলিসে, ভয় যত মোনাফিকে। বিংশ শতাব্দীর মুসলিম ইতিহাসে স্বজন বেশে ইসলামের সবচেয়ে

www.pathagar.com

বড় দুশমন ছিলেন তুরস্কের মোস্তফা কামাল এবং মিসরের জামাল আবদুন্ নাসের। মোস্তফা কামালের মিলিটারী একাডেমিক জীবনের পর থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন জীবনের বিভিন্ন মুখী কর্মকাণ্ড সামনে নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় যে, মোস্তফা কামাল যেন জন্ম নিয়েছিলেন ইসলাম উৎখাতের জন্য। আবু জেহেল আর আবু লাহাবের ভূমিকাও তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

মোস্তাফা কামাল তুরস্কের সালোনিকায় ১৮৮১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা আলী রেজা ছিলেন ওসমানীয় ঋণ প্রশাসনের অধীনে একজন সরকারী কেরানী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও সরল প্রকৃতির মানুষ। চাকুরীর আয়ে তার সংসার চলতোনা। তাই অফিস ছুটির পর সামান্য ব্যবসা করতেন। মা যোবায়দা ছিলেন নিরক্ষর; কিন্তু খুবই ধর্মপরায়ণা ও অত্যন্ত পর্দানশীলা। মা চেয়েছিলেন ধার্মিক ওস্তাদের কাছে ছেলে লেখাপড়া শিখুক; কিন্তু কোন ওস্তাদই তাকে বাগে রাখতে পারেননি। বন্ধু বান্ধবদের সংগে বড় মিশতেন না, মিশলেও ঝগড়াঝাটি মারামারি করতেন। স্কুলের এক শিক্ষক তাকে স্কুলে প্রহার করেছিলেন, ব্যস্ স্কুল গমন বন্ধ। তারপর আর কি করা? চাচার পরামর্শে সালোনিকার মিলিটারী ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। পালে যেন বাতাস লাগলো। সাধারণ লাইনের লেখাপড়ায় ভীষণ অমনোযোগী মোস্তফা মিলিটারী লাইনের লেখাপড়ায় হয়ে ওঠলেন অত্যন্ত মনযোগী। পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল দেখালেন। একজন শিক্ষক তার অদ্ভুত মেধার পরিচয় পেয়ে 'কামাল' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। ১৯০৫ সালে ক্যাপটেন পদমর্যাদায় অত্যন্ত কৃতীত্বের সংগে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোন। সে সময় তুরস্কে উগ্র জাতীয়বাদী ভালান (valan) অর্থাৎ পিতৃভূমি নামের একটি ছাত্র সংস্থা ছিল। তিনি তাতে যোগ দেন। এই সংস্থা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এর শাসনব্যবস্থাকে মোটেই সহ্য করতো না। তারা এই সুলতানকে উৎখাতের জন্য বিভিন্ন মুখী প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামকে তারা মনে করতো তুরস্কের অধোগতির জন্য দায়ী। ইসলামের শরীয়ত ছিল তাদের চক্ষুশুল। ইসলামের পর্দা প্রথার ছিল তারা ঘোর বিরোধী। উলামার প্রাধান্য খর্ব করাই ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী আর ধর্মীয় পণ্ডিত তথা আলেমদের নির্মূল করাই ছিল সংস্থার

www.pathagar.com

জরুরী এজেণ্ডা। পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রবর্তন আর নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাই ছিল সংস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। মোস্তফা কামাল সেই ছাত্র সংগঠনের প্রধান হয়ে গেলেন। ১৯০৮ সালে সুলতান আবদুল হামিদ নব্য তুর্কীদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হোন। ক্ষমতাসীন দলে মোস্তফা কামালের ডাক পড়লো। তিনি যোগদান করলেন। যোগদান করেই কনুই গুতা দিয়ে যাকে তার দৃষ্টিতে চক্ষুশূল মনে হলো তাকে সরাতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রী, প্রিন্স সাঈদ হালিম পাশা (১৮৬৫-১৯২১), সমরমন্ত্রী আনোয়ার পাশা (১৮৮২-১৯২২) এবং আরো কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলমান মন্ত্রীকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরবর্তী দশ বছরে নিজের অবস্থানকে অত্যন্ত সুসংহত করে তোললেন। গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্কের বিজয় তাকে যেন জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো। তুরস্কের জনগণ তাকে গাজী উপাধিতে ভূষিত করলো। অতঃপর তিনি ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইসের মত 'I am the state' উক্তির চেয়েও একধাপ উপরে ওঠে বললেন "I am Turkey ! To destroy me is to destroy Turkey"। ১৯৩৮ সালে মোস্তফা কামাল মারা গেলেন; কিন্তু তুরস্ক ধ্বংস হয়নি। আজও বেঁচে আছে এবং ভালভাবেই বেঁচে আছে, বাঁচেনি শুধু' I am Turkey "দম্ভোক্তিকারী কোন দাম্ভিক আতাতুর্ক। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সাল, এই ১৫ বছর ছিল তার একচ্ছত্র শাসনকাল। ক্ষমতায় আসার পর তিনি ইসলামের মৌল নীতিগুলো উৎখাত আর মৌলবাদীদের তুরস্কের মাটি থেকে নির্বাসন দেয়ার জন্য হেন প্রচেষ্টা নেই যা তিনি করেননি। তিনি ইসলামের এত ক্ষতি সাধন করেছিলেন, যা আবু জেহেল, নমরুদ ফেরাউন পারেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম কোন না কোন ভাবে তখনও অনেক তুর্কী মুসলমানের ঈমানে আর চরিত্রে ছিল। এখনতো আন্দোলন হিসাবেই বেঁচে আছে। ক্ষমতা হাতে নিয়েই তিনি বললেন 'আমি তুরস্কের জাতীয় জীবন থেকে ইসলাম বিতাড়ন করবো। এই ইসলাম তুরস্ককে আগে বাড়তে দিচ্ছেনা। পাঁচশত বছর আরব শেখদের ইসলাম তুরস্ককে শাসন করেছে, তুরস্কের মানুষকে অলস বানিয়েছে, তুরস্কের সিভিল ও ফৌজদারী আইন ইসলামের নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়েছে। ইসলাম আরবের ধর্ম,এই ধর্ম একটি মৃত বস্তু, এ ধর্ম মরুবেদুঈনদের ধর্ম হতে পারে, প্রগতিবাদী রাষ্ট্র ও জাতির জন্য তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়'। উপহাস করে বলতেন, 'ওহী! সে আবার কি বস্তু? আল্লাহ নেই। আল্লাহ ও

www.pathagar.com

ওহীতে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষকে বন্দী করার শৃংখল বিশেষ'। ১৯২৪ সালের ৩ রা মার্চ তিনি খেলাফত শাসনের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। খলিফাও খলিফার পরিবারকে সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসন দেন।

মোস্তফা কামাল এসময়ে ইউরোপে শিক্ষা প্রাপ্ত এক সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ মহিলার নাম ছিল লতিফা। লতিফাকে তিনি পুরুষের মত পোষাক পরিধান করতে এবং নারীর সমানাধিকার আন্দোলন করতে বললেন। লতিফা কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে বেঁকে বসলেন। তিনি সাফ বলে দিলেন, ওসব আমার দ্বারা হবেনা। তোমার খেয়ালের তালে তালে আমি নাচতে পারবো না। স্ত্রীর মর্যাদা চাই, রক্ষিতার মর্যাদা চাইনা। মোস্তফা কামাল একথা শুনে ক্ষেপে গেলেন। তাকে পরিত্যাগ করলেন এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর শুরু হলো মোস্তফা কামালের জঘন্য উচ্ছৃংখল ও চরিত্রহীন জীবন যাপন। মদ গিলে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন। এলকোহলে ডুবে থাকতেন। সুদর্শন বালকদেরও তিনি অসৎ উদ্দেশ্যে চতুষ্পার্শে রাখতেন। তাদের সংগে যা ইচ্ছে তাই করতেন। তাঁর মন্ত্রীদের এবং অধস্তন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সুন্দরী স্ত্রী, বোন ও কন্যার উপর হাত বাড়াতে শুরু করেন। অনেকে তাদের স্ত্রী, বোন ও কন্যা তাঁর থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতেন। ১৯৩৮ সালে তিনি অতিশয় মদ্যপান ও যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার গুপ্ত পুলিশ বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে আনতো আর বিনা বিচারে নিধন করতো। দুর্দিনে যারা তাকে সাহায্য করেছিল তাদের তিনি নিজের সুদিনে আগে খতম করেন। তাঁর কাছে যে শত্রু বলে গণ্য হতো, সে বাঁচার সব অধিকার হারাতো।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিনে সংসদের নতুন অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন, 'এতদিন ইসলামকে যে ভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার অবসান ঘটিয়ে ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায় আমি প্রতিষ্ঠিত করবো।' কিভাবে তিনি ইসলামকে 'স্বীয় মর্যাদায়' অধিষ্ঠিত করেছিলেন সেই কাহিনী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার আগে 'ইসলামকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার'–এর অজুহাত যারা তোলেন, তারা কখন এই অজুহাত তোলেন তা আমাদের জানা দরকার। ইসলাম যখনই আন্দোলন হিসাবে গড়ে ওঠে, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জোর আওয়াজ ওঠে, তখন মুসলিম নামের ঐ

www.pathagar.com

মোস্তফা কামালরা ইসলামকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার' না করার জন্য আবেদন জানায়। আবেদনে কাজ না হলে শক্তি দিয়ে ইসলামপন্থীদের আন্দোলনকে নিস্তেজ করে দেয়ার চেষ্টা করে। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ঐ কামালী– শ্লোগান ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল এবং বর্তমান বাংলাদেশেও ঐ কামালপন্থীরা ''ইসলামকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার না করার'' আন্দোলন করে যাচ্ছেন। এ কামালী দর্শনের যা ছিল ১৯২৪ সালে তুরস্কে, ১৯৮৯ সালে ঐ দর্শন বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যায় কিনা সে ষড়যন্ত্র চলছে। আগামী দিনের খবর আল্লাহই ভাল জানেন। এবার দেখা যাক, ১৯২৪ সালের কামাল 'ইসলামকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার' না করে 'ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায়' কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে সব বাংলাদেশী কামাল একই শ্লোগান দিচ্ছেন, তারা বাংলাদেশে তাই করবেন যা তুরস্কের কামাল জিয়া গোকালপের (ZIYA GOKALP)-এর পরামর্শে তুরস্কে করেছিলেন। দর্শন এক, শ্লোগান এক, কর্মসূচী এক, আন্দোলনও এক, অতএব ফলাফল কি এক না হয়ে পারে?

মোস্তফা কামাল 'ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত' করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি ধর্মীয় আইনের ভিত্তিতে বিধান প্রদানকারী 'শায়খ উল–ইসলাম' পদের অবসান ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও তিনি একই সাথে শরীয়ত মক্তবালয়, মাদ্রাসা, মক্তব ও ধর্মীয় বিচারালয়ের বিলোপ সাধন করেন। শুধু ধর্মীয় বিধান পালনের সময় ছাড়া ধর্মীয় পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ওসমানীয় শাসনামলে যত ইসলামী বিধান প্রচলিত ছিল, সে সব আইনকে মোস্তফা কামাল 'মধ্যযুগীয় আইন' বলে অভিহিত করেন এবং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, এই মধ্যযুগীয় আইনের বদলে পাশ্চাত্য আইনই হবে তুরস্কের আইন। এই প্রেক্ষিতে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের প্রচলিত দেওয়ানী আইন, ইতালীর ফৌজদারী আইন এবং জার্মানীতে প্রচলিত বাণিজ্য আইনের অনুকরণে নতুন আইন ব্যবস্থা তুরস্কে প্রবর্তন করেন। সুইজারল্যাণ্ডের আইন কতখানি তুরস্কের জন্য গ্রহণযোগ্য তা যাচাই করার জন্য মোস্তফা কামাল ১৯২৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ২৬ সদস্য বিশিষ্ট এক কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন যাচাই বিচার করে যে রিপোর্ট পেশ করে, তা তুরস্কের সংসদ ১৯২৬ সালের

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ তারিখে গ্রহণ করে এবং ৪ ঠা অক্টোবর থেকে বাস্তবায়ন করে। এই নতুন আইন প্রচলনের ফলে বহু বিবাহ, তালাক প্রভৃতি ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তারপর একে একে অনেকগুলো পরিবর্তন আনা হয়। আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান বর্ণমালার প্রবর্তন করেন। আরবী সংখ্যার পরিবর্তে রোমান সংখ্যা গ্রহণ করেন। রোমান হরফে তুর্কী ভাষা লেখা বাধ্যতামূলক করেন এবং ১৯২৮ সাল অতিক্রান্ত হবার পর আরবী হরফে তুর্কী ভাষা লেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরেন। ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে কান্তানোনুতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি পর্দা প্রথাকে একটি সভ্য জাতির পক্ষে অপমানকর বলে মন্তব্য করেন এবং পর্দা প্রথা জোর করে তোলে দেয়ার নির্দেশ জারী করেন। শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার ছুটির দিন ঘোষণা করেন। মক্তব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার ফলে আলেম-ওলামা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে পড়ে। দেশের প্রখ্যাত আলেমদের তিনি নানা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে কারারুদ্ধ করেন এবং অনেক শ্রদ্ধেয় আলেমকে সুকৌশলে দুনিয়া থেকে বিদায় করেন।

মৌলবাদ উৎখাত করে তিনি 'কামালবাদ' সৃষ্টি করেন। তার কামালবাদ ছয়টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ছয়টি নীতি হচ্ছে এই (১) প্রজাতন্ত্রবাদ (২) জাতীয়তাবাদ (৩) গণবাদ (৪) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ (৫) ধর্ম নিরপেক্ষবাদ এবং (৬) বিপ্লববাদ। এখানে ধর্মনিরপেক্ষবাদ নীতি ছাড়া বাদ বাকি ৫ টি নীতি এই পুস্তকের মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলে কোন আলোচনা করিনি। শুধু তার 'ধর্মনিরপেক্ষবাদ' সংক্ষেপে আলোচনা করছি। ধর্ম নিরপেক্ষবাদের যারা প্রবক্তা, তারা সব সময়ই বলে থাকেন যে, ধর্মনিরপেক্ষবাদ কখনো ধর্মহীনতা নয়। কিন্তু এই মতবাদ যারা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তারা একথা প্রমাণ করে ছাড়েন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা, অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানা ইত্যাদি। ভারত এই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের আদর্শ উদাহরণ। মোস্তফা কামাল তার কামালবাদের ৬ টি মূল নীতি ঘোষণা করার সময় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধর্মহীনতা নয় তা বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন। এমনকি 'ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার' ওয়াদাও করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য ১৯২৪ সালের সংবিধানে ইসলামকে 'তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ধর্ম' ঘোষণা

www.pathagar.com

করতে ভুল করেননি। এই রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে তিনি কি ভাবে 'স্বীয় মর্যাদায়' অধিষ্ঠিত করেছিলেন' তা পূর্বেই বলেছি। তার আমলে কোরআন শরীফ মুদ্রণ, কোরআন শিক্ষা, ওয়াজ মাহফিলও বন্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে নয় বরং 'ধর্মনিরপেক্ষবাদকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত' করার জন্য সব রকমের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তার এই ধর্ম নিরপেক্ষবাদ যখন পুরোপুরি 'স্বীয় মর্যাদায়' অধিষ্ঠিত হলো তখন ১৯২৮ সালের ৫ই এপ্রিল পিপলস পার্টি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করে এবং ঐ মাসের ১০ তারিখে জাতীয় সংসদে এই মর্মে একটি আইনও গৃহীত হয়।

এই তো হলো ধর্ম নিরপেক্ষতার আসল রূপ, 'ইসলামকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত' করার প্রকৃত ভেদ হাকিকত, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মূল তাৎপর্য আর মৌলবাদ উৎখাত করে 'কামালবাদ' প্রতিষ্ঠার মূল রহস্য। বাংলাদেশী মৌলবাদ-বিরোধীরা মৌল তথা ফরজ ওয়াজেব বাদ দিয়ে অমৌল তথা নফল মুস্তাব নিয়ে বা শবেবরাতের হালুয়া আর ঈদের খানাপিনায় সন্তোষ্ট থাকতে বেশী ভালবাসেন। আমার মতে মোস্তফা কামাল মৌল অমৌল কোন পন্থীই ছিলেন না। তিনি ইসলামকে কখনো বরদাশত করেননি। 'ইসলাম' শব্দটি তিনি ততদিন ব্যবহার করেছিলেন, যতদিন ধর্মনিরপেক্ষবাদ অর্থাৎ ধর্মহীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। ইসলাম উৎখাতের জন্য মুসলিম নামের সকল নাস্তিক আর সেক্যুলারিষ্ট 'ইসলাম' শব্দটি প্রথম পর্যায়ে তাদের লক্ষ্যের উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশের সংগে কামালীয় দর্শনের অপূর্ব মিল মহব্বতও লক্ষ্যণীয়। মোস্তফা কামাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৫ বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তুরস্কের মাটি থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য। দৃশ্যত দেখা গেছে যে, তিনি সফল হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তা পারেননি। তার চর অনুচর এবং সভাসদের মধ্যে অনেকেই গোপনে ইসলাম অনুসরণ করতেন, কেউ কেউ তার মুখ বরাবর নাস্তিক্য মতবাদের বিরোধীতাও করেছেন। এজন্য তাদেরকে চরম শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। পল্লী এলাকার জনগণ নিয়মিত নামাজ রোজা আদায় করতেন। তার মৃত্যুর পর ইসলাম ধীরে ধীরে আবার সর্বত্র মাথা তুলে দাড়ায়। বর্তমানে তুরস্কে ইসলাম একটি বিপ্লব

www.pathagar.com

হিসাবে অত্যন্ত সক্রিয়। ইসলাম তুরস্কে আছে ও থাকবে। মোস্তফা কামালও ইতিহাসে আবু জেহেলের মর্যাদায় বেঁচে থাকবেন।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী অমৌলবাদী নাসেরের কথা

মোস্তফা কামালের কন্ঠে 'মৌলবাদ উৎখাত' শব্দটি অবশ্য উচ্চারিত হয়নি; কিন্তু মিসরের জামাল আবদুন নাসেরের কণ্ঠে 'মৌলবাদ উৎখাত' শব্দটি হরদম উচ্চারিত হয়েছে। মোস্তফা কামাল আর জামাল আবদুন্ নাসেরের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই, মোস্তফা কামাল ছিলেন আগাগোড়া একজন নাস্তিক আর জামাল আবদুন নাসের ছিলেন নাস্তিকের কাছাকাছি একজন পাক্কা সেক্যুলার। নাসের তার লেখা 'বিপ্লব দর্শন' পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন 'আমি পুরোপুরি নাস্তিক অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট হয়ে যেতাম, শুধু একারণে হইনি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয় বলে। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে আল্লাহকে কি পরিমান যে তিনি খুশী রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা তার দেড় যুগের শাসন কালই বড় প্রমাণ। এমন কট্টর সেক্যুলারই তিনি ছিলেন, যা দেখে জালেম নাস্তিকও শরমে মুখ লুকাতো। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের কর্মী ও নেতৃবর্গের সংগে তিনি যে আচরণ করেছেন তা নাস্তিক লেলিন স্টালিনের আচরণকে ম্লান করে দিয়েছে। মোস্তফা কামাল তুরস্কের চৌহদ্দি থেকে ইসলামের মুলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন আর জামাল নাসের ইসলামের বিপ্লবী চেতনাকে নিস্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইতে উভয়ই ছিলেন একমন; একপ্রাণ ও একই লক্ষ্যের মানুষ। মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘকে 'মৌলবাদী' ও 'মধ্যযুগীয়' বলে ডাকতেন। জামাল আবদুন্ নাসেরের শাসনামল (১৯৫৪-১৯৭০) কেমন ছিল, তার ধর্মনিরপক্ষতার আসল স্বরূপ কি, তিনি ইসলামের প্রতি কি আচরণ করেছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসার জবাব অবগত হওয়ার সুযোগ যাদের নেই, তারা জয়নব আল গাজ্জালীর আইয়্যাম মিন হায়াতী এবং রায়েফ-এর আল বাওয়া বাতুস সাওদা বাংলায় অনুদীত নাম যথাক্রমে 'কারাগারে রাতদিন' এবং 'ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান'-এই দুটি বই পাঠ করলে নাসের-চরিত্রের অনেক কিছু জানতে পারবেন। অত্যাচারী ফেরাউনের নির্যাতন নাসেরের নির্যাতনের কাছে শোচনীয় ভাবে হার মেনেছে। ইসলাম

www.pathagar.com

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে জামাল নাসের এক মূহূর্তের জন্যও মেনে নেন্‌নি বরং এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী দল এখওয়ানুন মুসলিমীনকে নির্মূল করার জন্য দলের কর্মী ও নেতাদের উপর এমন কোন শাস্তি নেই যা তিনি প্রয়োগ করেননি। তার ঘোষণা ছিল এই, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি আর রাশিয়ার কম্যুনিজম সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেয়ার পর ইসলাম ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু আমল করা যায়, ততটুকু আমল করা যেতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইসলামের প্রবেশাধিকার দেয়া যেতে পারে না। এই বিশ্বাসের এক কঠিন মহীরুহ ছিলেন জামাল নাসের। মিসরের এখওয়ানুল মুসলিমীন নাসেরের এই জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। 'সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম', এই হচ্ছে এখওয়ানুল মুসলিমীনের মৌল কথা। এ কারণেই তারা হয়ে গেলেন মৌলবাদী। বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। রাজনীতির অংগনে ইসলামের নাম নিলে তামাশা আর উপহাস করা হতো। নাসের ক্ষমতায় আসেন ১৯৫৪ সালে, কিন্তু এখওয়ান জন্ম নেয় ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ইসমাইলিয়া শহরে, মাহমুদিয়ার তরুণ স্কুল শিক্ষক শেখ হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে মাত্র ছয়জন লোক নিয়ে। ফিলিস্তিন যুদ্ধে এখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মিসরের নিয়মিত সরকারী সামরিক বাহিনীর চেয়েও অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার পরিচয় দেয়। শেখ হাসানুল বান্নাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার বার বার আহবান জানান। মিসরের ক্ষমতার আসনে বরাবরই অধিষ্ঠিত ছিল ইংরেজদের সভ্যতা সংস্কৃতির সেবা-দাসরা। বাদশাহ ফারুক ছিলেন সেই সভ্যতার যোগ্য মানস সন্তান। তাই তার প্রতি ইংরেজদের নির্দেশ ছিল, 'ফাণ্ডামেন্টালিস্ট দল এই এখওয়ানকে নির্মূল কর'। ফারুক যেহেতু ছিলেন সেই মানসিকতার গুণে গুণান্বিত শাসক; সুতরাং আন্তরিকতার সংগে প্রভুদের হুকুম তামিলে লেগে গেলেন। ১৯৪৮ সালে বাদশাহ ফারুক এখওয়ানের উপর নির্যাতন শুরু করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সালের মে মাসে যখন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার অবৈধ ঘোষণা দেয়া হয়, তখন লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীর ঘর বাড়ী জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ইহুদীরা চালায় অমানুষিক নির্যাতন। দেশ থেকে তাদের বিতাড়ন করতে থাকে। এই অবৈধ ঘোষণা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এখওয়ান স্বেচ্ছাসেবকরা বীর বিক্রমে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাদের ওপর শুরু

www.pathagar.com

হয় ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্মম শাস্তি। ওস্তাদ কামেল শরীফ তাঁর 'ফিলিস্তিন যুদ্ধে এখওয়ানুল মুসলিমীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'এখওয়ানের বীর মোজাহিদরা ইহুদীদের গড়ে তোলা দুর্ভেদ্য রক্ষা-ব্যূহ ভেদ করে যখন ইহুদীর সব আয়োজনকে তছনছ করার পর্যায়ে উপনীত এবং ইহুদীরা আত্মরক্ষার জন্য চীৎকার দিয়ে সাহায্য কামনা করছিল, তখন তাদের মদদগার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া এগিয়ে আসে। মিসরের তখনকার রাজতন্ত্র ছিল ইংরেজদের হাতের পুতুল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মিসরের রাজতন্ত্রকে লেলিয়ে দেয় এখওয়ানের বিরুদ্ধে। এখওয়ানুল মুসলিমুন দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। মিসরের প্রকৃত শান্তি-সমৃদ্ধির মৌল শক্তিকে দমনের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীতে হাসান আল বান্নাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৩ শে জুলাই স্বৈরাচারী ফারুক ক্ষমতাচ্যুত হোন। ক্ষমতায় আসেন জেনারেল নজীব। জেনারেল নজীবের ক্ষণস্থায়ী শাসনামলে এখওয়ানের উপর থেকে সরকারী নির্যাতনের অবসান ঘটে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইসলাম-বিরোধী চক্র তা সহ্য করতে পারেনি। জামাল নাসেরকে দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং তারা সফলও হয়। নাসের ক্ষমতায় বসেই এখওয়ান নির্যাতনের বাদশাহ ফারুকী ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করে নব উদ্যোমে নির্যাতন শুরু করেন। কি ভাবে এখওয়ান নেতৃবৃন্দকে দুনিয়া থেকে সরানো যায় এই ফন্দি আঁটতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে জামাল নাসের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাটি ছিল এই, এখওয়ানরা নাকি তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করছে। বানোয়াট সাক্ষ্য প্রমাণ আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এখওয়ান নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ ই নভেম্বর সামরিক আদালতে চলে বিচার নামের প্রহসন বা বিচার বিচার খেলা। রায় আগেই তৈরী করে রাখা হয়েছিল, তবুও নামকা ওয়াস্তে শুনানী হলো। তারপর ফাঁসির আদেশ। যাদের ফাঁসিতে ঝুলানো হলো, তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবি আবদুল কাদের আওদা, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুহাম্মদ মনসুর আলী, ইউসুফ তালয়াত, ইবরাহীম তাইয়্যেব, হিন্দাবী দুয়াইব, মুহাম্মদ আবদুল লতিফ প্রমুখ এখওয়ান নেতা। ডঃ সাঈদ রামযান, মুস্তফা আলম, আল আলমাবি, আহমদ সুলায়মান এবং কামেল শরীফের অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ

www.pathagar.com

দেয়া হয়। এ সময় ২৩ জন এখওয়ান কর্মীকে কারাগারে গুলি করে হত্যা করা হয়। এত সব করেও যখন নাসের দেখলেন যে, এখওয়ানের মৌল শক্তি বা শিকড় উৎপাটন করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার মনে হলো, পশ্চিমা পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে তিনি যেন সফল হতে পারছেন না। দেশের জনগণের দিকে তাকিয়ে দেখেন; তারা বোবা কিন্তু চাপা ক্ষোভে যেন কখন ফেটে পড়ে এমন অবস্থা। ঠিক এ পর্যায়ে রাশিয়া থেকে তাঁর ডাক পড়লো। তাঁকে আমন্ত্রনের গোপন রহস্য ছিল এই, 'নাসের, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। মৌলবাদী এখওয়ানদের কি ভাবে উৎখাত করতে হয় সে কৌশল আমাদের জানা আছে। উৎখাত-অভিজ্ঞতা পশ্চিমাদের চেয়ে আমরা বেশী জানি। অতএব কাল ক্ষেপণ না করে আমাদের কাছে চলে আস''। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে তিনি রাশিয়া গেলেন। তাঁকে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বরণ করা হলো। কোজবি (কমিতেত গসুদারস্তভেনই বেজোপাসানস্তি) এর ঘাঘু কলা কুশলীদের থেকে তিনি সবক নিলেন। তাদের আচরণে তিনি বিমুগ্ধ হলেন। খুশীর চোটে তিনি ২৭ শে আগষ্ট মস্কোতেই প্রবাসী আরব ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে বলে ফেললেন, দেশে গিয়ে কিন্তু এবার আর আমি এখওয়ানদের ছাড়ছিনা। মূল্যেৎপাটন কি ভাবে করতে হয় তা জানা হয়ে গেছে'। তিনি দেশে এলেন। ফাঁসিতে আর কাদের ঝুলানো যায় সেই নাম গুলো মস্কো থেকে সত্যায়িত করে আনলেন। এখওয়ানের শিকড় উপড়ানো কি ভাবে সম্ভব হয় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য মস্কোর দেয়া নীল-নকসা অনুযায়ী উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি ১৯৬৬ সনে নিয়োগ করেন এবং এই কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিল সেসব সুপারিশের খসড়া আগেই কমিটির হাতে তোলে দিয়েছিলেন। খসড়াটি তিনি এনেছিলেন মস্কো থেকে। সুপারিশ গুলো ছিল এইঃ

১। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসে এখন থেকে দ্বীনিয়াত এবং ইসলামের ইতিহাস আর থাকবেনা। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শিক্ষা কারিকুলাম তৈরী করতে হবে।

২। জন সাধারণের ধর্মীয় চেতনা লোপ করার জন্য কম্যুনিজমকে দেশে কাজ করার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। ধর্ম-বিরোধী প্রচারণার ব্যাপারে পূর্ণ সরকারী সহযোগিতা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৩। এখওয়ানদের সাথে সরাসরি জড়িত নয় অথচ এখওয়ানের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এমন যে সব ব্যক্তি ও আলেম রয়েছে, তাদের এখওয়ান থেকে আলাদা করতে হবে। অতঃপর উভয় পক্ষকে এখন থেকে নির্মূল করার অভিযান শুরু করতে হবে। নতুবা এমন দিন আসবে যখন এই উভয় গ্রুপ একত্র হয়ে ক্ষমতা দখল করে ফেলবে। এখন থেকে এখওয়ানদের কোন প্রকার প্রচার প্রোপাগাণ্ডা এবং জাতীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানও করতে দেয়া যাবেনা। (বর্তমানে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সরকারী পর্যায়ে সেক্যুলারও নাস্তিক মহলের সমন্বিত উদ্যোগে। নাসেরী দর্শনের অপূর্ব মিল!) সভা অনুষ্ঠান পও করতে হবে। এখওয়ান কর্মী এবং শুভাকাংখীদের অব্যাহত হয়রানি ও নির্যাতনের মধ্যে রাখতে হবে। তাদেরকে সহায় সম্পত্তি থেকে উৎখাত করতে হবে এবং সরকার তা সংরক্ষণের কোন দায়িত্ব নিতে পারবেনা। এমন ভাবে তাদের হয়রানীর মধ্যে রাখতে হবে, যাতে তারা স্বাভাবিক রুটিন মোতাবেক কাজ করার কোন সুযোগ সুবিধা না পায়।

মৌলবাদী দলকে নিপীড়ন ও উৎখাতের নাসেরী দর্শন, যা মস্কো বিরচিত, তা বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ-প্রক্রিয়া চলছে। জামাল নাসের মস্কো থেকে পাওয়া ফর্মূলা অনুযায়ী মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ১৯৬৬ সালের ২৯ শে আগষ্ট সাইয়্যেদ কুতুব এবং আরো দুজন নেতাকে ফাঁসি দিয়ে উৎখাত অভিযান আরো জোরদার করা হয়। জামাল নাসের যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন হয়তো তিনি এই হতাশা নিয়ে মরেন যে, মৌলবাদীদের তো তিনি মূলোৎপাটন করতে পারেননি। এখওয়ানের মৌল বা শিকড় থেকে এখন অসংখ্য গাছ জন্ম নিয়েছে। ২৩ বছর বেআইনী থাকার পর আবার কাজ শুরু করেছে। বেআইনী থাকার বছর গুলোতে এখওয়ান মিসরে তেমন কোন তৎপরতা দেখাতে না পারলেও সিরিয়া, লেবানন, জর্দানও সুদান সহ বেশ কয়েকটি দেশে কাজ চালিয়েছে। শুধু মিসরের জন্য এখওয়ানের জন্ম হয়নি, সে প্রমাণ এখওয়ান দিয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম মহিলা চিন্তাবিদ মরিয়ম জামিলা বলেন, 'আমি মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেছি এবং আন্দোলনের প্রভাব স্বচক্ষে দেখেছি। একটা বিশেষ পরিবেশ ও

www.pathagar.com

পরিস্থিতির কারণে এ সংগঠনের কাজ সাময়িক ভাবে অনুপস্থিত ছিল; কিন্তু তাই বলে তা বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায় না। তাদের দাওয়াত আরো প্রসারিত হচ্ছে। বুদ্ধি বৃত্তিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ময়দানে পর্যন্ত তাদের আদর্শিক আন্দোলনের নতুন ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে এবং অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে।'

এই তো হলো মিসরের মৌলবাদ উৎখাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখওয়ান এখনও মিসরে আছে এবং থাকবে, যতদিন মিসরের মাটি থাকবে; কিন্তু কোথায় এখন নাসের আর তার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আন্দোলন?

যে দেশের মাটির গভীরে কালেমায়ে তাইয়্যেবার শিকড় সর্বত্র জালের মত ছেয়ে আছে সেই শিকড় উৎপাটন করতে হলে দেশের সব মাটি সরাতে হবে; কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। এক মাত্র ভূমিকম্প ছাড়া এত গভীরের শিকড় মাটির উপর উঠবেনা। তেমন ভূমিকম্প হলে তখন এই জমিনের কেউ বেঁচেও থাকবেনা। সুতরাং মৌলবাদীদের মৌল শিকড় রোজ কিয়ামত ছাড়া উৎপাটন সম্ভব নয়। এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতা মেনে নিলে কোন সংঘাত হয় না, অশান্তিও বিরাজ করেনা। মোস্তফা কামাল আর নাসেরের মৌলবাদী উৎখাত অভিযান আর তাদের ধর্ম নিরপেক্ষবাদের ব্যবহারিক ভাব, অর্থ, দৃষ্টান্ত এবং ইতিহাস থেকে আমাদের দেশের কামালী আর নাসেরী দর্শনের উদভ্রান্ত ভক্তরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশে অমৌলবাদী আন্দোলনের যারা দিক পাল, তারা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যখন কথা বলেন বা জঙ্গ করতে ময়দানে নামেন, তখন তাঁরা নিজেদের আয়নায় প্রত্যেকে নিজ নিজ চেহারা খানা দেখে নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ বেঈমানেরও ঈমান আছে। তা না হলে সে বেঈমান হতে পারেনা, যদিও সে ঈমান নিগেটিভ ঈমান। নিগেটিভ ঈমানের বেঈমানী 'মৌল' বলেই পাক্কা-বেঈমান কেউ কেউ হতে পারছে। অনুরূপ ভাবে যারা মৌলবাদীদের বিরোধীতা করছে, তারা বিরোধীতার ব্যাপারে শক্ত ভাবে 'মৌল' বলেই কারণে অকারণে পজিটিভ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লাফাচ্ছে। কথায় কাজে, চাল চলনে, চিন্তা ও ভাবনার ভিত্তিটা যদি মৌল না হয়, তা হলে গভীরতা আসেনা, লোকে বলে দোয়েল পাখি,শুধু লাফায়, স্থিরতা নেই। আওয়ামী লীগের নিষ্ঠাবান আওয়ামী লীগ বা

www.pathagar.com

কম্যুনিষ্টদলের নিষ্ঠাবান কম্যুনিষ্ট হতে হলে পার্টির মৌল নীতি–আদর্শের প্রতি কথায় ও কাজে মৌল অনুসারী হতেই হবে, তাহলে তাকে একনিষ্ঠ কর্মী বা নেতা বলা যাবে। এই সহজ কথাটি অমৌলবাদীরা মানেন্না। কারণ এখন তাদের মাথায় গরম খুনের প্রচণ্ড চাপ। অধিকন্তু রেজেক হালাল করার জন্য মুরব্বিদের চাপ যে রয়েছে। সুতরাং আশা করা যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় একদিন তারা ফিরে আসবেন, তখন শুধু আফসোসই করতে থাকবেন।

ঠান্ডা মাথায় মুক্ত মনে চিন্তা করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে রয়েছে মৌল ও অমৌল অনুসারী শ্রেণী। তবে অমৌলের সংখ্যা সঙ্গত কারণেই থাকে বেশী। সৃষ্টির শুরু থেকেই যে ধর্ম যেখানে প্রচারিত হয়েছে, সে ধর্মের মৌল অনুসারী সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে মৌলনীতি ও আদর্শের প্রতি দুর্বল অনুসারী বা ধর্ম–বিমুখ লোকও সৃষ্টি হয়েছে।

এস, এস, সি বা এইচ, এস, সি পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। পরীক্ষার ফলাফলের সংগে ধর্মাবলম্বীদের ঈমানী পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা অবশ্য করা যায়। সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায়, যত জন পরীক্ষা দেয় ততজন পাস করে না। যত জন পাস করে ততজন মেধা তালিকায় থাকেনা। প্রথম বিভাগে যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের থেকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের কতিপয় মেধা তালিকায় স্থান পায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে অনুত্তীর্ণ হয় পাস হওয়াদের অধিকাংশ। অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যার অর্ধেক তো হয় অবশ্যই। ধর্মানুশীলন আর ঈমানী অগ্নি–পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর অনুত্তীর্ণদের শ্রেণী বিভাগ এবং দৃষ্টান্ত সাধারণ পরীক্ষার ফলাফলের শ্রেণী বিভাগেরই অনুরূপ। এই বিন্যাস–রীতি ও নিয়ম দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ধর্ম–বিশ্বাস আর অনুশীলনের ক্ষেত্রে যারা আনুগত্য ও অনুশীলনের মেধা তালিকায়, তারাই মৌল। প্রথম বিভাগে যারা উত্তীর্ণ অথচ মেধা তালিকায় নেই, তারাও ধর্মের মৌল অনুসারী। দ্বিতীয় বিভাগে সফলকাম শ্রেণী ধর্মের মৌল সীমানায় রয়েছেন ব লা যায়, তবে তৃতীয় বিভাগে সফলকাম দলকে ধর্মের চৌহদ্দিতে অবস্থানকারী বলা হলেও তারা কেন্দ্র থেকে দূরে বহু দূরে অন্য বাড়ীর প্রহরীর টার্গেট পয়েন্টে রয়েছেন, এতটুকু না বলে পারা যায় না।

www.pathagar.com

'ফেইলবাজীদের' সাথে তাদের অল্প ব্যবধান। ধর্মের ক্ষেত্রে 'কোন ভাবে পাস' আর 'কোন ভাবেও না-পাসদের' অমৌলবাদী বলা যায় নিঃসন্দেহে। যে কোন ধর্মের অকৃতকার্যরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। কখন যে তারা কি করে বসে, তা বলা যায় না। উৎখাতের নামে উৎপাতই হচ্ছে বাংলাদেশী বে-বুঝ অমৌলবাদীদের কর্মসূচী। ভলগার পানি কোন না কোন পথে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। গঙ্গার পানি পদ্মা মেঘনায় ভাগ হয়েছে। পদ্মা মেঘনা গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গীয় মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলনের উৎস আর প্রবহমান এই স্রোতধারা অমৌলবাদীদের প্রেরণা ও শক্তি যোগাচ্ছে। একটি দলকে নির্মূল করার এমন চতুর্মূখী হামলার নজির বিশ্ব-ইতিহাসে ক'টি আছে, তা আমি জানি না। তবে এটাও এক ধরণের মৌল-বিরোধীতা বলা যায়।

খৃস্টান জগতে মৌলবাদ

খৃস্টান জগতে ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মানুসরণ ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ) এর পরই বাইবেল বিকৃতির ফলে নানা দল উপদলের সৃষ্টি হয়। কোন্ দল সবচেয়ে অকৃত্রিম, আদি ও খাঁটি, এ নিয়ে বচসাও কম হয়নি। 'মৌলবাদ' শব্দটির উদ্ভব খৃস্টান জগত থেকে। ১৯২০ সালে 'মৌলবাদ' আর 'মৌলবাদী' কথাবার্তা ধর্মীয় অংগনে প্রথম শুনা যায় আমেরিকায়। আমাদের দেশে যে ব্যঞ্জনায় 'মৌলবাদ' শব্দ উচ্চারিত হয়, তার ঠিক বিপরীত অর্থে ও ব্যঞ্জনায় উচ্চারিত হতো আমেরিকায় একদল খৃস্টানের কন্ঠে। 'মৌলবাদ' হওয়ার দাবিটি ছিল গর্বের। ঐ শ্রেণীটি দাবি করে, খৃস্ট ধর্মের মৌলবিশ্বাসী আর অনুসারী একমাত্র তারাই। এজন্য তারা সাগ্রহে সামনে এগিয়ে এসে নিজেদের ফাণ্ডাম্যানটালিষ্ট বা মৌলবাদী বলে দাবি জানায়। অথচ কে না জানে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৌল শিক্ষার প্রায় কিছুই তাদের কাছে নেই, অথচ যা আছে তা নিয়ে তাদের কি গর্ব! এই খৃস্টধর্মাবলম্বী দলের দাবির বেশ আগে একই ধর্মের আর একটি গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। এই গ্রুপের নাম প্রোটেষ্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী গ্রুপ। এই গ্রুপের সদস্যরা লিবারেল বা মডার্নষ্টি বলেও পরিচিত হয়ে ওঠে। সেই দল কিন্তু যুগের বিভিন্ন পরিবর্তন-বিবর্তন, উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের পিছনে পিছনে ধর্মকে নিয়ে চলার পরামর্শ দেয়। তাদের অভিমত হলো এই, বিজ্ঞানের আলো-হাওয়া-মুক্ত এবং রাজনীতির হুলাহল থেকে নিরাপদ দূরত্বেগীর্জার

www.pathagar.com

মধ্যে ধর্ম হেফাজতে থাকুক, বিজ্ঞান তার আপন পথে চলুক, রাজনীতি চলুক রাজনীতির পথে, ধর্ম চলুক ধর্মের পথে। তারা আরো বললেন, জাগতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মত শক্তি ধর্মে নেই। প্রেটেষ্ট্যান্ট গ্রুপ যে উদ্দেশ্যেই তা বলুক না কেন, বাস্তব অবস্থাও কিন্তু তাই। খৃস্ট ধর্মের মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করার মত কিছুই নেই সেই ধর্মে। বাস্তবতার আলোকে বিচার করলে এ রায় না দিয়ে পারা যায় না যে, খৃস্ট-ধর্ম চার্চের মধ্যে অন্তরীণ না থাকলে বাঁচারও উপায় নেই। কারণ বাইরে চলার মত এই ধর্মে অন্তর্নিহিত শক্তিও নেই। আমাদের দেশের অমৌলবাদীরা খৃস্টানী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে দেখেন আর প্রোটেষ্ট্যান্টদের মত বুলি বচন ছাড়েন। একমাত্র ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে কোন ধর্মই মানব জীবনের সকল সমস্যার পূর্ণ সমাধান দেয়ার যোগ্যতা রাখেনা। খৃস্টধর্মাবলম্বী হয়ে আমেরিকার লেখক-গবেষক মাইকেল এইচ হার্ট তার দি হানেড্রেড পুস্তকে রসুলে করিম (সঃ আঃ) কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ মুসলমান নামের কতকগুলো বে-আক্কেল, বে-আমলী আর বেওমিজ লোক খৃস্টানী চশমা দিয়ে ইসলামকে দেখে আর ভাবে, ইসলামও তো একটি ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম যা পারেনি, ইসলামও তা পারবে না। ইসলাম যে বিকলাঙ্গ বা পুষ্টিহীন দুর্বল কোন ধর্ম নয় বরং ইসলাম সবল-সুঠাম, আত্মরক্ষায় এবং আত্ম নির্ভরশীলতায় সম্পূর্ণ সক্ষম, এ জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। যা হোক, খৃস্টান মৌলবাদীরা এই উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, ওরা বিজ্ঞানের নামে খৃস্টান মৌল শিক্ষাকে বরবাদ করে দিচ্ছে। ১৯২৫ সালে চার্লস ডারউনের 'বানর' মতবাদটি মার্কিন মুল্লুকে আরেক ঝড় তুলে। এই ঝড় সৃষ্টিতে মৌলবাদী দল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মতবাদের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

অমৌলবাদী খৃস্টানরা ধীরে ধীরে ধর্মের আঙ্গিনা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ১৯৭৫ সালের এক জরীপে দেখা যায়, অমৌলবাদীদের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে গেছে। শেইলার ম্যাথুজ, চার্লস ব্রীগস এবং এসি মাইকেল গিফার্ট প্রমুখ ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ ছাড়া তাদের আর কোন কর্মসূচী পালন করতে দেখা যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই খৃস্টান মৌলবাদী শক্তি বৃদ্ধি পেতে

www.pathagar.com

থাকে। ১৯৭১ সালে একমাত্র আমেরিকাতেই মৌলবাদী খৃস্টানদের সদস্য সংখ্যা ৩০ লক্ষ অতিক্রম করে। খৃস্টান মৌলবাদী সংগঠন ১৯২০ সালে একটি দাবি নিয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের মোকাবেলায় আত্মপ্রকাশ করলেও প্রকৃতপক্ষে এই মৌলবাদী সংগঠনের ভিত্তি ১৮৭০ সালে স্থাপিত হয়। এ সময়টা ছিল মিলেনেরীয়ান (millenarian) আন্দোলনের সূচনা কাল। এই মিলেনেরীয়ান আন্দোলনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সহস্রতম বার্ষিকী'; সেই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা তাদের আন্দোলন প্রায় একই অর্থেই পরিচিত করে তোলে। মিলেনারীয়ানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঈসা (আঃ) এই পৃথিবীতে মশরীরে আগমন করবেন এবং আগামী হাজার বছর বিশ্বের মানুষ শান্তির জীবন-যাপন করবে।

উইলিয়াম মিলার নামে নিউইয়র্কের একজন ফার্মার ঘোষণা করেন, ১৮৪৩ সালে অথবা এরও আগে ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বার এই দুনিয়াতে আসবেন। এই বিশ্বাস-ভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল ১৮২৫ সালে। ঘোষণার সাথে সাথে আমেরিকাতে প্রায় এক লক্ষ সমর্থক সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৪৩ সাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন দেখা গেল যে, ঈসা (আঃ) তো পৃথিবীতে এলেন্ না, তখন এ আন্দোলনের নেতারা পথে ঘাটে শুধু জনগণের বিদ্রুপ আর উপহাস কুড়াতে থাকেন। সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ভোল পালটিয়ে টিকে যায় এই দলের গ্রেট বৃটেন শাখাটি এবং বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই দল থেকে জন্ম নেয় দু'টি গ্রুপ; কিন্তু সেই দু'টি গ্রুপের তৎপরতাও ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার আগমন না করার ফলে বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে এই মিলেনেরীয়ানরা তাদের মতবাদ সংশোধন করে নেয়। তখন তারা বলে, ঈসা (আঃ) অবশ্যই আবার পৃথিবীতে আসবেন তবে কখন আসবেন তা বলা যাচ্ছেনা। মিলেনেরীয়ানরা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিয়াগ্রা ও নিউইয়র্কে তাদের সম্মেলন চলতে থাকে। ১৮৯৯ এবং ১৯১৪ সালে নিয়াগ্রায় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মত দ্বৈততার অবসান ঘটেনি। জেমস এইচ ব্রুকস পরে দল থেকে আলাদা হয়ে যান। ১৯১৯ সালে নিউইয়র্ক এবং ফিলাডলফিয়ায় বিশ্ব খৃস্টান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে নতুন নামকরণ হয় 'মিলেনেরীয়ান ফ্যাণ্ডামেন্টালিষ্ট মুভমেন্ট'।

'খৃস্টান জগতে মৌলবাদ' শিরোনামে যে আলোচনা করলাম, সে আলোচনায় মিলেনেরীয়ানের প্রসঙ্গটি পাঠকদের কাছে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়া

www.pathagar.com

স্বাভাবিক। আমি বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছি। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যত দল উপদল রয়েছে, প্রত্যেক দল উপদলের কিন্তু একই দাবি 'আমরাই ফাণ্ডাম্যানটালিষ্ট'। প্রোটেষ্ট্যান্টরা প্রতিবাদী দল হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খৃস্ট ধর্মের প্রসারে ফাণ্ডাম্যানটাল চিন্তাধারার মানুষ বলে দাবি করে থাকে। খৃস্টান জগতে ফাণ্ডাম্যান্টাল শব্দ নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি, অথচ বাংলাদেশে এনিয়ে চলে গালাগালি! অর্থ ও ব্যঞ্জনার কি অদ্ভুত বৈপরীত্য!

খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৌলবাদী এবং অমৌলবাদী সীমারেখা টানা হয় পাচটি মৌলনীতির ভিত্তিতে। পাঁচটি মৌলনীতিতে যারা বিশ্বাসী, তারাই মৌলবাদী, আর যারা এর কোন একটি বা একাধিক মৌলনীতির বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্ণ বা আংশিক অনীহা প্রকাশ করে অথবা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেয়, তারা বিভিন্ন সাংগঠনিক নামে পরিচিত হলেও অমৌলবাদী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না। তাদের আশংকা হচ্ছে এই, অমৌলবাদী হওয়া মানে ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। যা হোক, যে পাঁচটি মৌলনীতি খৃস্টান মৌলবাদীদের মৌল পরিচিতি, তা হচ্ছে এই (১) বাইবেল আসমানী কিতাব; যা যীশুর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই বাইবেল সকল অনুপ্রেরণার উৎস। (২) যীশু অলৌকিকভাবে কুমারী মেরীর গর্ভে জন্ম (The Virgin birth) গ্রহণ করেন। (৩) যীশু সকল পাপীদের পাপ মোচন (Atonement) করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। (৪) মৃত্যুর পর শেষ বিচার (Resurrection) অবশ্যই হবে এবং (৫) যীশু দৈব কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন এ বিশ্বাস থাকতে হবে। এই পাঁচটি মৌল বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারা খৃস্টান মৌলবাদী। খৃস্টানদের মধ্যে যারা প্রকৃত মৌলবাদী তথা কঠোর নিষ্ঠাবান ধর্মানুরাগী, তাঁরা মদ্যপান করেন না, নৃত্য করেন না, সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করেন না। তাঁরা অশ্লীলতাকে বর্জন করে চলেন। মৌলবাদী খৃস্টানদের প্রধান মুখপত্র 'ক্রিস্টানিটি টুডে'। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট জগতে মৌলবাদ

আমরা যাদের কম্যুনিস্ট বলে থাকি, সেই কম্যুনিস্ট মতবাদ 'কম্যুনিজম'-এর জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতে; কিন্তু এই মতবাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্বও রূপলাভ করে বিংশ শতাব্দীতে। কার্ল মার্কসকে (১৮১৮-৮৩) আধুনিক সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের জনক বলা হয়। সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ বলা যেতে পারে। তবে অবস্থানগত হেরফের কিছু আছে বটে। কার্ল মার্কস বলেছেন, সাম্যবাদের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং উচ্চতর স্তর হচ্ছে সাম্যবাদ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই সাম্যবাদ সমাজে উন্নীত হয়। এ জন্য রাশিয়ার সাম্যবাদকে মার্কসীয় সামজতন্ত্র (Marxian Socialism) বলা হয়ে থাকে। লেলিন বলেছেন, 'The only Scientific distinction between Socialism and Communism is that the first term implies the first stage of the near society arising out of Capitalism, while the second implies the next higher stage. _Marx Engles Lenin on Scientific Communism, Moscow, 1967, p-460 অর্থাৎ সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ-এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য শুধু এই যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদের পরিণতির পরে গঠিত সমাজের প্রাথমিক স্তর এবং সাম্যবাদ হচ্ছে এর পরবর্তী উচ্চস্তর।

সুতরাং যারা বলে, 'আমরা সোশালিষ্ট, কিন্তু কম্যুনিস্ট নই; অথবা আমরা কম্যুনিস্ট, কিন্তু সোশালিস্ট নই, তারা কম্যুনিস্ট আদর্শের দৃষ্টিতে নমরী গাদ্দার আর বেঈমান। এবার দেখা যাক সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের জনক বলে কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় যিনি খ্যাত, তাঁর প্রচারিত মতবাদের মৌল ভিত্তি কি? মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের জন্মের বহুকাল পূর্ব থেকে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে নানা আকারে নানা প্রেক্ষাপটে ও নানা ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংল্যাণ্ডের টমাস ম্যুর, জেমস হ্যারিংটন ফ্রান্সের লুই ব্লাঙ্ক, সেন্ট সেইম্যান প্রমুখের কল্পনা-বিলাসী সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism), নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শো, এইচ জি ওয়েলেসে, গ্রাহাম ওয়ালারদের ফেবিয়ান

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র (Fabian socialism), পোপ এয়োদশ লিয়ো-এর খৃস্টীয় সমাজতন্ত্র (Christian Socialism), ফ্রান্সের জর্জ সরেলের সংঘমূলক সমাজতন্ত্র (Sydicalism), পেশাগত সমাজতন্ত্র (Guild Socialism) এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (State Socialism) পর কার্ল মার্কস তার সমাজতন্ত্রের তিনটি মৌল নীতি নিয়ে সমাজতন্ত্রের নতুননতুন অধ্যায়ে আবির্ভূত হোন। তাঁর সমাজতন্ত্রের মৌল ভিত্তি হলো (১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical materialism, (২) শ্রেণী সংগ্রাম (Class struggle) এবং (৩) উদ্বৃত্ত মূলতত্ত্ব (Theory of surplus Value)। তাঁর এই তিনটি মৌলনীতির ব্যাখ্যা করলে তন্মধ্যে রক্তপাত, উৎপাত, উপদ্রব, অশান্তি, অরাজকতা আর শোষণ-পীড়ন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কার্ল মার্কস দার্শনিক হেগেলের ডায়লেকটিক থিওরীর ভাববাদী ক্রিয়াকে জড়বাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন আর ঐ একই জড়বাদী চরিত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটিয়ে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি বলতে পারেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানব সমাজের বিবর্তনের প্রতিটি স্তর অবশ্যই বস্তুতান্ত্রিক প্রগতির স্তর বিশেষেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। অর্থাৎ তিনি ইতিহাসের কোথাও কখনো মানুষের সুবুদ্ধি, সুরুচি, সুবিবেক, সুবিবেচনা, হৃদয়ের উদারতা, মহত্ত্ব, মানবিকতা, নৈতিকতা প্রভৃতি মহৎগুনের কোন অস্পষ্ট ছায়াও দেখতে পাননি। তার পেটের উপরে যে হৃদয়টা ছিল আর তার উপরেও মাথার মধ্যে বিবেক আর মগজটা ছিল, তিনি কেন যে তাও দেখলেন না, তা আমার আজও বোধগম্য হয় না। তিনি দেখলেন শুধু একটা পেট, যার ধর্মই হলো শুধু 'খাই খাই'। তিনি হেগেলের ডায়লেকটিক মতবাদকে এজন্য হৃদয়ে আর বিবেকে ঠাঁই না দিয়ে 'খাই খাই' গহবর পেটেই ঠাঁই দিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় মৌল নীতি 'শ্রেণী সংগ্রাম' হচ্ছে উৎপাত, উৎখাত, সংঘাত তথা খুনাখুনীর অপর নাম। তাঁর ভাষায় 'অধ্যাবধি বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস 'শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস' ছাড়া আর কিছু নয়।' অর্থাৎ তাঁর মৌল জীবন-দর্শন আর মৌল তত্ত্বফৌজদারী অপরাধ-উপাদানে সমৃদ্ধ। দুই দলে দলাদলি সৃষ্টি করে মারামারি রক্তারক্তির সূচনা ঘটানোই হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচী।

মার্কসীয় মৌল তৃতীয় উদ্বৃত্ত মূলতত্ত্ব হচ্ছে কল কারখানায় অকারণে 'হাউ কাউ'

www.pathagar.com

লাগানোর একটা অব্যর্থ 'ককটেল বোমা' বিস্ফোরণ বিশেষ। মালিক যতই দিতে থাকবে, শ্রমিক ততই বলতে থাকবে 'আরো দাও'। বিশ্বাস এখানে কাজে লাগবেনা। অবিশ্বাসই সম্প্রীতিকে সর্বদা তাড়া করতে থাকবে। চাহিদা ও যোগানের ধারণা তাঁর বিশাল দ্যাস ক্যাপিটালের কোথাও নেই। শুধু শ্রমকে মূল্য-সৃষ্টিকারী উপাদান হিসাবে ধরে নেয়া কোন অবস্তাতেই ঠিক নয়, অথচ তাই তিনি ধরেছেন। এ জন্য দেখা যায় যে, কলকারখানায় যখনই সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিকেরা ঢুকে, তখনই শুরু হয় হেগেলী দ্বন্দ্ব আর মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম। এই মৌল তিনটি নীতির প্রতি যারা কথা ও কাজে এক, তারাই মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মৌলবাদী। এই সমাজতন্ত্রের মৌল দর্শনের উপর ভিত্তি করে বলশেভিকদের নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসীয় দর্শনের প্রধান মৌলবাদী ব্যক্তিত্ব লেনিনেন মৃত্যুর (১৯২৪) পর স্টালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে মৌলনীতি নিয়ে বিরোধ বাধে। ট্রটস্কির অভিমত ছিল এই, ধনতান্ত্রিক বিশ্বের বেড়াজালের মধ্যে একটি মাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা চলতে পারে না। কিন্তু ট্রটস্কির কথা স্টালিন শুনতে রাজি হলেন না, তাঁকে দেশ ছাড়া করলেন। তারপর ষ্টালিন পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে শাসন করতে লাগলেন। স্টালিন সোভিয়েত রাশিয়ায় ইতিহাসকে কি ভাবে খুন-রাঙা করছেন সে সম্পর্কে এস লেবিসের 'স্টালিনের রাশিয়া' পুস্তকে উল্লেখ রয়েছেঃ

To sum up, One can reckon that a total 10,00,000 people Were slaughtered in the years from 1929 to 1939. The fact is that by his massacre of his officials alone, stalin outdid ten times .... twenty times within the space of one year, all the repression carried out by Czarism against all sections of Russian society during the course of almost a century.

অর্থাৎ স্টালিন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ১০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছেন। তিনি এক বছরে যত অফিসার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোককে হত্যা করেছেন, জার শাসনের একশত বছরের মধ্যে এত হত্যাকাণ্ড ঘটেনি।

কম্যুনিস্ট মতবাদের মৌল নীতি নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। বিশ্বের প্রধান দুই কম্যুনিস্ট দেশ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব তুঙ্গে, মৌলনীতি নিয়েই মত বিরোধ। কার্ল মার্কসীয় দর্শনের মৌল নীতি লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিনের

www.pathagar.com

হাতে প্রচণ্ড মার খায়। তিনি প্রকাশ্যে মার্কসকে সাম্যবাদের শত্রুবলে গালি দিতেন। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ নামে যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু আছে তাও অনেকটা ফ্রি-স্টাইল ধরণের। সমাজতান্ত্রিক ডিক্টেটরশীপের আওতায় শুধু ডাণ্ডা দিয়ে যতটুকু পারা যায় ততটুকু ঠাণ্ডা রাখা হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এখন কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় আসল মৌলবাদী কম্যুনিষ্ট নজরে পড়ে না। নানা মতে পথে কম্যুনিস্টরা বিভক্ত, তবে প্রত্যক দল উপদল এ দাবিই করে যে, প্রত্যেক দল উপদলই কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রকৃত মৌলবাদী। প্রত্যেক দলই মৌলনীতি অনুসরণ করছে বলে দাবি করে থাকে। কম্যুনিজমের মৌলনীতি নিয়ে এত মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যতটুকু মিল তাদের মধ্যে রয়েছে, তা হচ্ছে এই, ঃ

একঃ কম্যুনিস্ট মৌলবাদী হতে হলে সর্ব প্রথম যে গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে তা হলো এই 'তাকে অবশ্যই ধর্মের সকল প্রকার বন্ধন থেকে মনে প্রাণে মুক্ত হতে হবে। শুধু মুক্ত হওয়াই বড় কথা নয়, তাকে হতে হবে একজন পাক্কা নাস্তিক।

ধর্ম সম্পর্কে কার্ল মার্কস সুস্পষ্ট ভাবে তার দ্যাস ক্যাপিটল গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন, 'Religion is the opium of the people' অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য আফিম তুল্য। 'লেনিন অন রিলিজন' পুস্তকে ধর্ম সম্পর্কে লেনিনের অভিমত এভাবে লেখা আছে ''জড়বাদের অপর নাম মার্কসবাদ, আর মার্কসবাদ ধর্মের শত্রু' একই পুস্তকের অন্য একস্থানে বলেছেন 'ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুধু চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং এ সংগ্রাম বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের সম পর্যায়ে আসা অপরিহার্য। এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে সমাজ থেকে বিষফোঁড়া-সদৃশ্য ধর্মের ভিত্তি সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করা''।

কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এইঃ Its membership is open to no one who does not whole heartedly and outspokenly declare himself an athiest. (soviet communism, Webb-p-814) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য

www.pathagar.com

হতে পারবেনা, যদি সে মনে প্রাণে সুস্পষ্টভাবে নাস্তিক বলে ঘোষণা না করে।

১৯২২ সালে রাশিয়ায় 'গডলেস' সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখন থেকে রাশিয়ার মাটি থেকে ধর্মকে উৎখাত শুরু করতে হবে। ১৯২৯ সালের মে মাসে নাস্তিক্যবাদকে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর ধর্ম উৎখাতের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি সমগ্র রাশিয়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এসব পদক্ষেপের ফলাফল কি দাড়িয়েছিল সেই ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয়। সেই ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে আলোচনা থেকে বাদ রাখলাম।

দুইঃ কম্যুনিস্ট মৌলবাদীদের দ্বিতীয় গুণটি হতে হবে 'শ্রেণী সংগ্রামী চরিত্র'। অর্থাৎ হিংসাত্মক রাজনীতি (Agitational Polilics)। সহজ কথায় বলা যায়, এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণীকে লাগিয়ে দেয়া, সংঘাত সংঘর্ষ আর রক্তারক্তির রাজনীতি দ্বারা সকল শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতাটা হাতে নিয়ে বিশেষ এক শ্রেণীর লোক দ্বারা দেশ পরিচালনা করাই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামীদের মূল উদ্দেশ্য। কাল মার্কস বলেন, "নীতিগত ভাবে আমাদের (সৃষ্ট) কাজ হচ্ছে, যুদ্ধ অথবা মৃত্যুঃ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অথবা ধ্বংস।" এঙ্গেলস বলেন, "ধনিক শ্রেণী ও দরিদ্রের মধ্যে আমাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পৃথিবীর সমগ্র যুদ্ধ বিগ্রহকেও অতিক্রম করে যাবে।"

তিনঃ কম্যুনিস্ট মৌলবাদীদের তৃতীয় যে গুণটি থাকতে হয়, তাহচ্ছে সুবিধাবাদী চরিত্র। যাকে বলা যায় 'যখন যেমন তখন তেমন'; কিন্তু ভিতরে থাকতে হবে শিকারী মনটা। এই মৌল গুণটির অনুকূলে স্বয়ং লেনিনের উক্তি হলো এই, 'প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে মেহনতি জনতার ঐক্যের নামে (মঙ্গলের জন্য নয়) যা কিছু করা দরকার সবই বৈধ। আমাদের বিরোধীদের সাথে সংগ্রামে মিথ্যা চালবাজি ও প্রতারণার অস্ত্র ব্যবহার একান্তই প্রয়োজন'। বিখ্যাত কম্যুনিস্ট লেখক ওয়েব (Webb)-এর 'কম্যুনিজম' নামক পুস্তকের ৮৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত একটি সংলাপ এখানে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। একজন দায়িত্বশীল কম্যুনিস্ট নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

www.pathagar.com

'সমাজতন্ত্রীদের ন্যায়-অন্যায় বিচারের মাপকাঠি কি?" জবাবে তিনি বলেন, "যে কাজ সমাজতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য, তা ভাল হোক আর মন্দ হোক,ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক, সেটা গ্রহণ করার নীতিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রীদের ন্যায়-অনায় বিচারের মাপকাঠি।" ষাট দশকে মালয় কম্যুনিস্ট, পার্টির সহকারী সম্পাদক মিঃ ইয়ং কমটো লিথোকরা ইশতেহারের মাধ্যমে বন্ধুদের বলে দেন, "নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কাজে আসবে, কোথাও এমন কোন পার্টি বা প্রতিষ্ঠান থাকলে আমাদের ঐগুলোতে ঢুকে পড়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। এ বিষয়ে কোন পরোয়াই করবেনা যে, ঐ পার্টি নিরপেক্ষ না পশ্চাদপদ, প্রতিক্রিয়াশীল না অপ্রতিক্রিয়াশীল অথবা রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক।

লক্ষ্য করার বিষয়, বাংলাদেশ সহ মুললিম দেশগুলোতে মুসলিম সমাজের মধ্যে সমাজতন্ত্রীরা মুসলিম নাম নিয়ে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করছে। বাংলাদেশে তো তারা মাথায় টুপী দিয়ে মসজিদ কমিটিগুলোতেও ঢুকে পড়েছে। মোটামোটি ভাবে বলা যায়, কম্যুনিস্ট মৌলবাদীদের এই তিনটি হচ্ছে তাদের মৌল ভিত্তি। সব দেশের সব ফেরকার কম্যুনিস্টের এটাই হচ্ছে মৌল চরিত্র। তারা এই মৌলনীতির ভিত্তিতে রক্তপাত ঘটিয়ে যখন যে দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়, তখন তাদের শাসন ব্যবস্থার অধীনে সে দেশের মেহনতি মানুষের অবস্থা যা দাড়ায় তা কবির ভাষায় বলা যায়ঃ

"নাই অধিকার ফরিয়াদ করার, না আছে কান্নার অনুমতি,
রুদ্ধ কন্ঠে মরে যাব আমি, এ হচ্ছে প্রভুর সুমতি"

তখন সমাজতন্ত্রী গোয়ালে মানুষ হয়েও পশুর মত জীবন যাপন করা ছাড়া বিকল্প চিন্তাও কেউ করতে পারেনা। এতদসত্বেও সুযোগ পেলেই তারা দেশ ছেড়ে পালায়, ভিন দেশে আশ্রয় নেয়, বার্লিনের বিরাট প্রাচীরও তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারেনা, গুলি খেয়েও ওপারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এই হচ্ছে কম্যুনিস্ট মৌলবাদী হওয়ার মৌল নীতি আর তার পরিণতি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কম্যুনিস্টরা একটা আদর্শের সমর্থক, সেটা কারো পছন্দ হোক বা না হোক তা ভিন্নকথা। তারা তাদের মৌল আদর্শের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও কেন আর একটি আদর্শের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লেগে যায়, তা আমাদের জানা দরকার। কারণ হিসাবে হয়তো বলা হবে যে, ধর্মের বন্ধন-মুক্তির জন্য তাদের এ বিরোধীতার বড় প্রয়োজন। অস্বীকার করা যায় না, এ উদ্দেশ্য তো রয়েছে। কিন্তু আমার মতে, সবচেয়ে বড় কারণ হলো 'ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের সহ অবস্থান অসম্ভব এবং অকল্পনীয়', তাই সমাজতন্ত্রীরা সুকৌশলে আস্তিকদের একটি বিশ্রান্ত শ্রেণীকে প্রভাবিত করে রক্তাক্ত শ্রেণী সংগ্রামের জন্য ময়দানে নামায় । জারোশ্লাভস্কি গুবেলম্যান –এর সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক বর্ষপঞ্জীর ২৮ পৃষ্ঠায় (১৯২৯) সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, " সমাজতন্ত্র ও ধর্ম পরস্পর বৈরী সুলভ আদর্শ। এই দুটিকে কখনো পাশাপাশি স্থান দেয়া সম্ভব নয়। ধর্মের যেখানে প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের সেখানে বিনাশ। ধর্ম থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারলেই সেখানে কম্যুনিস্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।"

আশ্চর্য! যে কথা কম্যুনিস্টরা বুঝে, সে কথা সেক্যুলারপন্থী মুসলমানরা বুঝেন না। ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে কম্যুনিস্টরা সেক্যুলার দলে ভিড়ে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার সংগ্রাম করে থাকে। এটা তাদের প্রথম মৌলনীতি বাস্তবায়নের অতি সূক্ষ্ম টেকনিক। পরিতাপের বিষয়, সরকারের কোন কোন কর্তাব্যক্তি বুঝে বা না বুঝে তাদের টেকনিককেই বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন বলে মনে হচ্ছে। এই তাত্ত্বিক মৌলবাদী কম্যুনিস্টরা বাংলাদেশের যে দলকে মন করছে যে, তাদের বিপরীত আদর্শের মৌলবাদী অর্থাৎ যে দলের কাছে ধর্ম ও রাজনীতি এক ও অভিন্ন, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে জনগণ থেকে সেই দলকে এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার সংগ্রাম করছে। যদি তারা এই সংগ্রামে সফল হয় তাহলে বাংলাদেশে ইসলাম মসজিদেও একদিন আশ্রয় পায় কিনা সন্দেহ। কারণ, বাংলাদেশের তিন দিক সেক্যুলারদের কাঁটা তারের বেড়ার বেষ্টনীর মধ্যে। সুতরাং এ চ্যালেঞ্জের অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে আর ফয়সালায় আসতে হবে যে, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার আন্দোলনের কাছে আমরা

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করে দেশটাকে তুর্কিস্তান বানাবো, না কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের জালবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবো।

পাস্তারনাক-এর 'ডঃ জিভাগো' পড়তে যদি আমাদের দেশের মুসলিম নামের কম্যুনিস্ট ভাই বোনদের শরম লাগে, তাহলে তারা পোল্যান্ডের কবি এ্যাডাম ভাযিক-এর একখানা কবিতা পাঠ করতে পারেন। তিনি এই কবিতা লেখেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। তখন পোল্যান্ডে চলছে ষ্টালিনিস্টদের নির্মম শাসন ও শোষণ [Large estates were abolished, industries nationalized, Schools secularized and Roman catholic prelates jailed. Farm production fell off. Harsh working conditions caused a riot in poznan in june 28-29, 1956.] অর্থাৎ বড় বড় জমিদারী উচ্ছেদ করা হয়, কলকারখানা জাতীয়করণ করা হয়, শিক্ষালয় গুলোকে সেক্যুলার করা হয়, রোমান ক্যাথলিক যাজকদের কারারুদ্ধ করা হয়। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। নিষ্ঠুর কর্ম-পরিবেশের কারণে পোজনানে ১৯৫৬ সালের ২৮ থেকে ২৯ শে জুন ভয়াবহ দাঙ্গা হয়।

এই অবস্থাকে সামনে রেখে এ্যাডাম ভাযিক যে কবিতা লেখেন তা এইঃ-

এখানে কর্মক্লান্ত মানুষ আছে,
পোল্যান্ডে আপেল আছে-যা পোলাণ্ডের সন্তানরা পায়না।
এখানে শিশু আছে- তাদের অপরাধ, ডাক্তাররা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে।
এখানে নিষ্পাপ বালক আছে- তাদের মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়।
এখানে নিষ্পাপ বালিকা আছে- তাদের মিথ্যা বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়।
এখানে মানুষ আছে- তারা শুধু ইনসাফের অপেক্ষা করছে।
এখানকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছে।
এদেশে আমরা আপেল করি,
মানুষের নামে আপেল করি।
ঐ মানুষের নামে যারা কর্মক্লান্ত।
আমরা ঐ সব তালা চাই- যা আমাদের দরজায় লাগাতে পারি।
আমরা ঐ সব কক্ষ চাই, যাতে জানালা আছে।
ঐ সব প্রাচীর চাই, যা ভগ্ন ও বিশ্রী নয়।
হাঁ, শুধু এজন্য- যাতে মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারি।

www.pathagar.com

বলার অপেক্ষা রাখেনা, যাদের বিরুদ্ধে পোলান্ডের কবির অভিযোগ, তারা যে দেশে যখন গিয়েছে, সে দেশে এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে; শোষণ করেছে, খোয়াড়ে আবদ্ধ করে জীবিত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, জুলুম নির্যাতনের ষ্টিম রোলার দিয়ে নিষ্পেষণ করেছে। পোলান্ড আজও তাদের কব্জায়; কিন্তু সেই কব্জতে ওয়েলেসারা আঘাতের পর আঘাত হানছে, আপেল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হোক তা বোধ হয় আমরা কেউই চাইনা। কিন্তু দেশে দেশে তাদের এই চেহারা ও চরিত্র ধরা পড়ার পরও তারা থামছেনা। সাম্যবাদের মৌলবাদী হওয়ার দাবিও তারা ত্যাগ করেছে না। শ্রেণীতে শ্রেণীতে রক্তাক্ত সংঘাত সংঘর্ষের বীজ সর্বদা বপন করেই চলছে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদ ঃ লা-দ্বীন মতবাদ

মৌলবাদের আলোচনায় সেক্যুলারিজম কেন?

মৌলবাদ আর অমৌলবাদ নিয়ে যখন আলোচনা, তখন সেক্যুলারিজম সম্পর্কে কেন আলাদাভাবে আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম? এ প্রশ্ন অনেকের মনে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। উত্তরে আমার সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই, বাংলাদেশে মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যারা এক জোট হয়েছেন, তাদের জীবন-দর্শনের ভিত্তি, পরিচিতি এবং আন্দোলনের প্রধান অবস্থান সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আমরা এই আন্দোলনের আসল চরিত্রটাই বুঝতে পারবোনা। এ প্রসংগের ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে এখানে একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে এনে আপনাদের কাছে পেশ করছি। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই, মোস্তফা কামাল আর জামাল আব্দুন্ নাসের সম্পর্কে আমি পৃথক পৃথক শিরোনামে যে আলোচনা করেছি, তাতে একথা বোধহয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিম নামের এই ব্যক্তিদ্বয় ইসলামের 'মৌল' উৎপাটনের জন্য এই সেক্যুলারিজমকে প্লাটফরম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মোস্তফা কামাল তুরস্ক থেকে ইসলামের মৌল ভিত্তি উৎখাত-পরিকলপনা বাস্তবায়নের আগে নিজেকে সেক্যুলার হিসাবে পরিচয় দেন, ইসলামকে রাষ্টধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ইসলামকে 'স্বীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার' ঘোষণাও করেন, অতঃপর ইসলামের শিকড় উৎপাটনের কাজে হাত দেন। জামাল আব্দুন্ নাসেরও আগা গোড়া নিজেকে সেক্যুলার বলে পরিচয় দিয়েছেন, যদিও তিনি 'ওহী' ও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। এই উদাহরণ দিয়ে আমি একথা বুঝাতে চাই যে, ইসলামের মৌল বা শিকড় উৎপাটনের কাজে যারা হাত দেন, তারা যদি হোন

www.pathagar.com

মুসলিম নামধারী, তাহলে তারা মুসলমানদের ভয়ে নিজেদেরকে নাস্তিক বলে জাহির করেন্ না বরং সেক্যুলারিষ্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেন "আমরা তো ইসলাম বিরোধী নই, আর সেক্যুলারিজম মানে ধর্মহীনতা নয় 'যার ধর্ম তার কাছে, 'রাষ্ট্রের তাতে বলার কি আছে'। রাজনীতির জায়গায় রাজনীতি, ধর্মের জায়গায় ধর্ম। লাকুম দিনুকুম ওয়ালইয়াদীন"। কি সুক্ষ্ম চাল! বিভ্রান্ত করার কি বিষময় মধুর মধুর বচন! অথচ ওরাই ইসলামের শিকড়ের বারোটা বাজায়। নাস্তিক যা পারেনা, তা তারা পারে। কারণ নাস্তিকের প্লাটফরম মুসলমানরা চেনে। তাই দূর থেকে দেখেই হুঁশিয়ার হয়ে যায়, কাছে ভিড়ে না। কিন্তু সেক্যুলারিষ্টদের প্লাটফরমের কোনায় ধর্মের প্লেকার্ড থাকে বলে সাধারণ মুসলমান ধোকায় পড়ে যান। সরল মনে তাদের বিশ্বাস করে বসেন, কিন্তু পরে হোন প্রতারিত, ঈমান হয় লুন্ঠিত। সুতরাং আমার বিশ্বাস হচ্ছে এই, মুসলমানের কাছে সেক্যুলারিজম হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের চেয়েও বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। বাংলাদেশে যারা মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলনে শরীক হয়েছেন, তারা কৌশলগত কারণে নাস্তিকদের প্লাটফরমে একত্রিত না হয়ে সেক্যুলারিষ্ট প্লাটফরমে একত্রিত হয়েছেন। এজন্য সেক্যুলারিজমকে আগে জানা দরকার। কারণ, সেক্যুরিষ্টরা এক ধরণের মোনাফেক, তারা তাদের চরিত্রের কাছাকাছি দলে থাকে আবার বিপরীত অবস্থানের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে। তাদের কারবার হাতির দাঁতের মত, বাহিরেরটা দেখাবার জন্য আর ভিতরেরটা চিবানোর জন্য। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, কেন আমি সেক্যুলারিজম নিয়ে পৃথক ভাবে আলোচনা করছি।

ভুল তরজমাঃ সেক্যুলার কখনো 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয়

বাংলাদেশে পাকিস্তানী আমল থেকে যে কেউ যখনই সেক্যুলার, সেক্যুলারিজম বা সেক্যুলারিষ্ট সম্পর্কে কিছু না কিছু লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন, প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেছেন, সিম্পোজিয়াম সেমিনার ও সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লেখালেখি করেছেন, প্রত্যেকেই সেক্যুলারকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ দিয়ে বুঝেছেন এবং অন্যদের বুঝিয়েছেন। আমিও তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলাম, এতদিন আমিও ভুল বুঝেছি। যতজন এ পর্যন্ত এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন তারাও না বুঝে ভুল

www.pathagar.com

করেছেন। এই ভুল তরজমার কারণেই এই ইংরেজী শব্দটি নিয়ে এত ভুল বুঝাবুঝি, কিলাকিলি ও গুতাগুতি হয়েছে। শব্দটির সঠিক তরজমা হলে একে নাস্তিকতার ছোট ভাই মনে করে মুসলমানরা দূরে থাকতেন অথবা সেক্যুলারিষ্টদের দুর করতে চেষ্টা করতেন, কখনো কোন রকম ধোকায় ও পড়তেনা বা বিভ্রান্ত হতেন না।

ইংরেজী সেক্যুলার শব্দের বাংলা তরজমা যে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা', এই তরজমা প্রথম কে করেছেন তা আমরা জানিনা। প্রথম তরজমাকারী ব্যক্তিটিকে জানার জন্য পন্ডিত ও গবেষকরা যদি গবেষণায় বসেন, তাহলেও বোধহয় এ তথ্যটি উদঘাটন করা সম্ভব হবে না। যাহোক, ঐ তরজমাকারী যে কেউ হোন, তার ধর্ম পরিচিতি যেটাই হোক, তিনি খুব চালাক পন্ডিত ছিলেন বলে আমার ধারণা। তিনি কখনো ধার্মিক ছিলেন না বরং নাস্তিক বা হাফ নাস্তিক 'সেক্যুলার' ছিলেন, সে ধারণাও করা যায়। এমন এক তরজমা তিনি করেছেন, যা যুগ যুগ ধরে "নিরপেক্ষতার" ঠুলি বাংলা ভাষাভাষী অগনিত মানুষের চোখে লাগিয়ে অধর্মের জোয়াল কাঁধে চাপিয়ে নিরন্তর ঘুরাচ্ছেন। প্রথম তরজমাকারী সম্পর্কে এ ধারণাও করা যায় যে, বেচারা আসলে চালাকই ছিলেন না, সহজ সরল ছিলেন, তাই শব্দটির আকৃতি প্রকৃতি আর ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মোটেই ভাবতে পারেননি বা ভাববার সুযোগ পাননি; তাই সরল মনে এই তরজমা করেছেন।

যে কোন ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, শব্দের মুল অর্থ ও মূল ভাব কোন অবস্থাতেই যেন ক্ষুন্ন না হয়। তরজমার এই প্রধান বৈশিষ্ট্যটি শিল্প-সুন্দর তরজমায় ফুটে না ওঠলে অন্তত ভাবের পরিস্ফুটন তো অবশ্যই হতে হবে। অর্থ ও ভাব, এই দুয়ের একটিও না থাকলে সেই তরজমাকে গ্রহণ করে নেয়া যায় না। ছায়া ধরে কায়া স্পর্শ করা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেক্যুলার শব্দের অর্থ ও ভাব কোনটাই "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দের প্রকাশ পায়নি। বিবাদীকে বিচারক ভেবে বসলে সেই বিচারক থেকে আঘাতই পাওয়া যায়, বিচার পাওয়া যায় না। 'না'-এর বিপরীতে 'হাঁ' আর 'হাঁ'-এর বিপরীতে 'না', বিধি অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে তারা অবস্থান করে। কখনো এই

www.pathagar.com

দু'য়ের মধ্যে সংঘাত হয় না। কারণ কেউ কারো নাগাল পায়না। কিন্তু 'হাঁ' আর 'না'স্ব স্ব অবস্থান থেকে ওঠে এসে একত্র হলেই লাগে যত গন্ডগোল। এই তরজমায়ও তাই করা হয়েছে লোড শেডিংয়ে মালা বদলের ঘটনার মত। স্ত্রীর গলায় যে মালা পরিয়ে দেয়ায় কথা, তা অন্ধকারে এমন একজনের গলায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে, যার সংগে বরের দূরতম কোন দাম্পত্য সম্পর্ক নেই। সেক্যুলার শব্দটির বাংলা তরজমাও তাই। যে অর্থ নিয়ে শব্দটি জন্ম নিল, ইংরেজরা সে অর্থেই প্রথমে বরণ করলো, অতঃপর তারা নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থের পরিবর্তন সাধন করে নিল। অর্থের যে অবয়ব দাড় করিয়ে গত চার শতাব্দী পর্যন্ত তারা শব্দটির ব্যবহার করে আসছে, তা আমাদের বঙ্গীয় পন্ডিতদের কেন নজরে পড়লো না, সে দুঃখ রাখি কোথায়? আমাদের পণ্ডিতেরা সেই অর্থের সংগে তরজমার কোন সংগতিও রাখেননি। তরজমার নামে তারা এমন এক অর্থবোধক শব্দ তৈরী করেছেন যা স্ত্রীর মালা শ্বাশুড়ীর গলায় তোলে দেয়ার মত ভুল বা আহাম্মকির মত একটা কিছু। পরীক্ষা করে দেখা যাক তরজমাটি কতটুকু ভুল ও বেমানান।

Secular শব্দটি ল্যাটিন শব্দ SECULARIS বা SAECULUM শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দের মূল অর্থ ও ভাবের সংগে সংগতি রেখে ইংরেজরা তরজমা করেছে A life time বা generation; কিন্তু আমাদের কে একজন বা একাধিক জন হাওয়া থেকে পাওয়া কল্পনা দিয়ে অর্থ করেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। লক্ষণীয়, ল্যাটিন মূল শব্দ আর ইংরেজী তরজমাকৃত শব্দের মধ্যে ধর্ম বা অধর্মের কোন নামগন্ধও নেই। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষতার কোন ইঙ্গিত ঈশারাও তন্মধ্যে নেই। অথচ আমাদের পন্ডিতেরা অভিধানের 'ধ' অংশ থেকে ধর্মকে আর 'ন' দ্বারা গঠিত শব্দগুলো থেকে 'নিরপেক্ষতা' এনে দুটোকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে জোর জবরদস্তি করমর্দন করিয়েই ছাড়লেন। Religion (ধর্ম) বা Impartial(পক্ষপাতহীন) শব্দ দুটির সামান্যতম ভাবও যদি এই আদি ল্যাটিন শব্দ বা ইংরেজী তরজমাকৃত শব্দে হালকাভাবে বা ঘুরানো ফেরানো অর্থেও উপস্থিত থাকতো, তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একটি তরজমা হয়েছে বলে গ্রহণ করে নেয়া যেত। জোর করে দুজায়গা থেকে দু'টি শব্দ এনে যুক্ত করা হয়েছে। মিললে মিলুক বা নাই মিলুক, বিভ্রান্তি বিস্তারে তো তাঁরা

www.pathagar.com

সফল হলেন। বাপ দাদার চৌদ্দ পুরুষেও কেউ শোনেননি যে, ধর্ম কখনো নিরপেক্ষ হয়। ধর্ম তো জন্মই নেয় অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে ধর্মের অনুশাসনে এনে সুপথে পরিচালনা করা, সুন্দর একটা সমাজ গড়া এবং অধর্মের দ্বারা বিষায়িত বাতাসকে নির্মল করা। ধর্মের যখন এই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী, তখন ধর্ম কেমন করে চোখ বন্ধ করে, কানে তুলা দিয়ে, হাত পা জড়সড় করে অচল লোকের মত ভজনালয়ে বসে নিরপেক্ষ নীরবতা পালন করতে পারে? ধর্ম যদি নিরপেক্ষই থাকে তাহলে ধর্ম কোন কর্মটা করার জন্য এ দুনিয়াতে এসেছে শুনি? পাপের কাছে ভিড়বেনা, পাপীর সাথেও কথা বলবেনা, পাপের উৎসও বন্ধ করতে যাবেনা, পাপীর জীবনকে পবিত্র করার কর্মসূচীও নেবেনা, এমন কঠিন নীরব-দর্শকের চরিত্র-সম্পন্ন নিরপেক্ষ ধর্মের প্রয়োজন তো এই সমাজ সংসারে আছে বলে আমি মনে করিনা। ধর্ম প্রচারকেরা যদি ধর্মনিরপেক্ষই থাকলেন তাহলে তারা প্রচারটা কি করলেন? রসূলে করিম (সাঃ আঃ) যদি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষই থাকলেন তাহলে লাত মানাতের মূর্তিগুলো অপসারিত হলো কিভাবে আর এত জেহাদ করলেন কে? এই অদ্ভুত তরজমা এসব প্রশ্নের কি জন্ম দেয় না?

সেক্যুলার শব্দের প্রকৃত তরজমা কি?

সেক্যুলার শব্দের বাংলা তরজমা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি প্রামাণ্য আধুনিক বা প্রাচীন কোন অভিধানেও নেই বরং যা আছে তা এর ঠিক বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। ল্যাটিন শব্দ 'সেক্যুলারিজ' বা 'সেক্যুলাম'কে ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত শব্দ 'এ লাইফটাইম' বা 'জেনারেশন'ঃ বাংলায় যার তরজমা হতে পারে 'একটি জীবনকাল' 'জীবন ব্যাপী' 'যুগব্যাপী' 'এক পুরুষ', 'এক খান্দান' বা 'এক যুগ' ইত্যাদি শব্দে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পনর শতাব্দী পর্যন্ত ল্যাটিন 'সেক্যুলারিজ' বা 'সেক্যুলামকে' ইংরেজী ভাষাভাষী পণ্ডিতেরা 'সেক্যুলার' শব্দে রূপান্তর ঘটিয়ে 'লাইফ টাইম' বা 'জেনারেশন' অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

ল্যাটিন ভাষা হচ্ছে প্রাচীন রোমের ভাষা। এই ভাষার যৌবন, সমৃদ্ধি ও স্থিতিকাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ৭৫ থেকে ২০০ অব্দ। তখন এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আর অর্থের ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, এই শব্দের

www.pathagar.com

সংগে ধর্মের বা মতবাদের কোন প্রকার সংযোগ ছিলনা। এই ল্যাটিন শব্দকে যখন ইংরেজী সেক্যুলার শব্দে রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যবহার শুরু হলো তখন তার অর্থ এবং ভাবেরও রূপান্তর ঘটলো। এই রূপান্তরিত অর্থেরও একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস শুরু হয় ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডে গীর্জা ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে ভিত্তি করে। এই কর্তৃত্বের ইতিহাস হচ্ছে এইঃ ঈসা (আঃ)–এর পর তাঁর প্রচারিত ধর্মকে অবিকৃত তথা আদি ও বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় গোটা ধর্ম–ব্যবস্থাকে কুসংস্কার গ্রাস করে ফেলে। অনেকের মনগড়া কথা, স্ব–উদ্ভাবিত নীতি ও চিন্তাধারা ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়া হয়। ফলে ঈসা (আঃ) এর প্রচাবিত ধর্মের খুঁটিগুলো একে একে ধসে পড়তে থাকে। পাদ্রীরা ধর্মের আসল ও নকল যতটুকু পেলেন ততটুকু দিয়ে গীর্জা ভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্র চালাতে থাকলেন। পনর শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত গীর্জা থেকেই রাষ্ট্র শাসনের ফরমান জারী করা হতো। পনের শতাব্দীতে খৃস্ট ধর্মের সংগে বিজ্ঞানের অমিল প্রকট ভাবে ধরা পড়ে। খৃস্টান পাদ্রীদের কাছে এমন কোন ধর্মীয় বিধি বিধান ছিলনা যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হয়। এখানে উল্লেখ্য, প্রথমে ছিল গ্রীক বিজ্ঞানের যুগ, তারপর এলো মুসলিম সভ্যতা ও বিজ্ঞানের যুগ। ইউরোপ ছিল জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। সুতরাং বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিহীন ইউরোপের অন্ধকার দিনগুলোতে পাদ্রীরা তাদের ইচ্ছামত 'যেমন খুশী তেমন' শাসন করতে থাকেন। এদিকে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার যত ধস নামতে লাগলো, ততই ইংল্যাণ্ড ইউরোপের অন্ধকার কাটতে লাগলো। অর্থাৎ তাদের মধ্যে এলো বিজ্ঞানের জাগরণ। এই জাগরণ যত বাড়তে থাকলো, পাদ্রীদের একচ্ছত্র শাসনে ততো ভাটা পড়তে লাগলো। জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ আবিষ্কার উদ্ভাবনের সংগে পাদ্রীদের মনগড়া কথার কোন মিল পাওয়া গেল না। লেগে গেল ধর্ম আর বিজ্ঞানে তথা গীর্জা আর রাষ্ট্রে লড়াই। এ লড়াই প্রায় দুই শত বছর চললো। মার্টিন লুথার (১৪৮৩–১৫৪৬) দুপক্ষের মধ্যে আপোষ করে দিলেন। তার আপোষের মোদ্দা কথা হলো এই, ধর্ম ব্যক্তি–জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক। ধর্মের সব কিছু থাকবে চার্চের হাতে আর পার্থিব যত কায়–কারবার আছে তা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে, তবে রাষ্ট্রের কর্তারা যখন রাষ্ট্র পরিচালনার শপথ নেবেন তখন চার্চের কাছে সেই শপথ গ্রহণ করবেন। মার্টিন লুথার এবং অন্যান্য মধ্যস্ততাকারী গীর্জা ও রাষ্ট্রের মাঝামাঝি নিষ্পত্তির শক্ত

www.pathagar.com

প্রাচীর এনে দাঁড় করালেন। পৃথকীকরনের এই প্রাচীরের নাম দেয়া যায় সেক্যুলারের প্রাচীর। সেক্যুলারের প্রাচীর গড়ার নিয়ম নীতি ও প্রক্রিয়া হলো 'সেক্যুলারিজম'। ইতিহাস তার যুক্তি প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে একথাই প্রমাণ করেছে যে, এই প্রাচীরের এপারে রয়েছে গীর্জা, সেখানে রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব নেই, এমনকি রাষ্ট্রের কোন হাওয়া বাতাস এই এলাকাকে স্পর্শ করা নিষেধ। আবার প্রাচীরের ওপারে আছে রাষ্ট্র, সেখানে গীর্জার কোন কর্তৃত্বতো নেই–ই, এমনকি গীর্জার বাতাসও সে এলাকায় প্রবাহিত হওয়া নিষেধ। এখানে 'নিরপেক্ষ' ভূমিকার কোন স্থান নেই। ধর্মের জায়গায় ধর্ম, রাষ্ট্রের জায়গায় রাষ্ট্র, মাঝামাঝিতে 'নিরপেক্ষ' কোন অবস্থানও নেই। কারণ একদিকে গীর্জা অন্যদিকে রাষ্ট্র, মাঝখানে বিভক্তি প্রাচীর। ইতিহাসের এই পর্যায়ে সেক্যুলার শব্দের নতুন প্রতিশব্দ ও ব্যখ্যা অভিধানে সংযোজিত হয়। তখন সেক্যুলার শব্দের ইংরেজী শব্দ সৃষ্টি করা হলো Worldly, temporal, Civil, Profane, Not ecclesiastical, এসব ইংরেজী শব্দের বাংলা তরজমা হয় পার্থিব, ঐহিক, রাজনৈতিক, লৌকিক, লোকায়ত, যাজকেতর লোক, বিষয়ী লোক ইত্যাদি। ল্যাটিন সেক্যুলারিজ বা সেক্যুলাম শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ A Life Time বা Generation সঠিক অর্থবোধকই ছিল। কারণ প্রাচীন রোমে কোন কোন খেলা হতো একজন মানুষের জিন্দেগীতে বা একটি জেনারেশনে মাত্র একবার বা দুবার। সেই অর্থে তখনকার ইংরেজী শব্দগুলো সঠিক অর্থ বহন করতো। হালের কোন কোন অভিধানে সেক্যুলার শব্দের ব্যাখ্যায় স্পষ্টত বলা হয়েছে, Secularism is the doctrine that State, Morality, Education etc. should be separated from religion অর্থাৎ ধর্ম থেকে রাষ্ট্র, শিক্ষা, নৈতিকতা ইত্যাদি যে মতবাদ পৃথক রাখে, তারই নাম সেক্যুলারিজম। চেম্বারস (টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী) অভিধানে (১৯৬৮ সালের মুদ্রণ) সাফ সাফ হরফে লেখা আছে "Secularism is the belief that the state, Morals, Education etc. should be independent of religion অর্থাৎ ধর্ম থেকে রাষ্ট্র, শিক্ষা, নীতি–নৈতিকতা ইত্যাদি স্বাধীন। এই বিশ্বাসই সেক্যুলারিজম। এখানেও স্পষ্ট কথা, সাধারণ জীবনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোকে এই সেক্যুলারিজম দূরে রাখে।

www.pathagar.com

এসব আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সেক্যুলারিজম মানে ধর্ম-মুক্ত পার্থিব ব্যবস্থা, লা-দ্বীন মতবাদ বা বস্তুবাদ, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। এই বস্তুবাদ যে হেগেলের বস্তুবাদ-ভিত্তিক কার্ল মার্কসের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', তাতেও কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এই বাস্তবাদ প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্যবাদের গর্ভজাত সন্তান যদি তাই হয়, তাহলে এই সেক্যুলারিজম আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা ভেবে দেখা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষবাদী প্রতারণার জালে আর কতদিন আমরা এভাবে বেহুশের মতো আটকা পড়ে থাকবো?

এ প্রসংগের ইতি টানার আগে একটি বিখ্যাত পুস্তকের বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি, যে পুস্তক ১৯৭৮ সালে গোটা বিশ্বে অচিন্তনীয় সাড়া জাগিয়েছিল। পুস্তকটির নাম 'দি হানড্রেড'। মাইকেল এইচ হার্ট-এর নেতৃত্বে আমেরিকার একদল বিখ্যাত বিষয়-বিশেষজ্ঞ লেখক-গবেষকের বহু শত ঘন্টা শ্রমের ফসল এই দি হানড্রেড। এই পুস্তক রচনায় যে একদল গবেষক ছিলেন, তারা সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং ইতিহাসে যাদের নাম আছে, তাদের মধ্য থেকে অনেক চিন্তা গবেষণা, যাচাই বিচার ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সর্বশ্রেষ্ট মানুষ হিসাবে দুই শত জনকে নির্বাচন করেন। এই দুই শতের মধ্য থেকে আবার যাচাই বিচার করে একশত জনকে তাদের বাছাই নীতিমালা অনুযায়ী 'প্রথম একশত সর্বশ্রেষ্ট' এর তালিকাভুক্ত করেন। অতঃপর এই শতজনকে বাছাই করে কার অবস্থান প্রথম, কার অবস্থান দ্বিতীয় বা তৃতীয় এভাবে বিন্যাস করেন। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিচার বিবেচনার পর পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ট মহা মানব হিসাবে প্রথম স্থান দেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ আঃ) কে। তাঁরা কি কি কারণে তাঁকে প্রথম স্থান দিয়েছেন, সেই কারণগুলোও উল্লেখ করেছেন। এসব কারণের মাত্র একটি এখানে প্রসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করছি। মাইকেল এইচ হার্ট সেই কারণকে এভাবে বলেছেন, He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. অর্থাৎ ইতিহাসের তিনি একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সফল ছিলেন। সাফল্যের আগে 'সুপ্রিমলী' যোগ হওয়ায় সাফল্যের স্তরটাও বুঝানো হয়েছে, যে স্তরের উপরে কোন স্তর নেই। এ প্রসঙ্গে এত কথা বলার উদ্দেশ্য মাত্র একটি, তা হচ্ছে

www.pathagar.com

'সেক্যুলার' শব্দটির ব্যবহার দ্বারা মাইকেল এইচ হার্ট কি বুঝেছেন এবং আমাদের কি বুঝিয়েছেন তা অনুধাবন করা। মিঃ হার্ট 'রিলিজিয়ন' এবং 'সেক্যুলার' এই দুটি শব্দকে আলাদা ভাবে ব্যবহার না করে কেন এই শব্দদ্বয়ের স্থলে 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে' বা অনুরুপ শব্দ কেন ব্যবহার করলেননা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এমন দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দুনিয়ার প্রত্যেক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। এখানে দুটি জিনিষ এই শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়। (১) গীর্জা থেকে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থেকে গীর্জা যে সম্পূর্ণ আলাদা, এই খৃস্টান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাইকেল এইচ হার্ট মুক্ত নন। এজন্য 'রিলিজিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করার সাথে সাথে সেক্যুল্যার শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাহলে কথাটা এই দাড়াচ্ছে, রিলিজিয়ন-মুক্ত যা কিছু আছে, সবই সেক্যুলার। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্মহীন জগতই সেক্যুলার জগত। যুক্তি আর হিসাবে তো তাই দাঁড়ায়। (২) মাইকেল এইচ হার্ট-এর এই শব্দ প্রয়োগ এই উদ্দেশ্যেও হতে পারে যে, যেহেতু ধর্মহীনতা তথা বস্তু ও বস্তুবাদী চিন্তাই সেক্যুলার এর ভিত্তি ও বিকাশের উৎস, তাই রিলিজিয়ান শব্দ দ্বারা তাঁর সাফল্যের রিজিওনকে সংযোজিত করা হয়ে যায়। তাই ধর্মীয় ও জাগতিক সাফল্যকে বুঝাবার জন্য রিলিজিয়ন ও সেক্যুলার এই উভয় শব্দের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

যা হোক, মাইকেল এইচ হার্ট অনেক কিছুই বুঝেছেনঃ কিন্তু বুঝেননি আ-দ্বীন বা ইসলামের পরিধিকে। ইসলাম এই জগতে এসেছে 'স্বর্গে যাওয়ার যা হোক, মাইকেল এইচ হার্ট অনেক কিছুই বুঝেছেনঃ কিন্তু বুঝেননি আ-দ্বীন বা ইসলামের পরিধিকে। ইসলাম এই জগতে এসেছে 'স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট' বিতরণের জন্য নয় অথবা মোহাম্মদ (সাঃ আঃ) দুনিয়ায় আসেননি এজন্যে যে, তাঁকে 'ত্রাণ কর্তা' হিসাবে স্মরণ করলেই তিনি সকলকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। ইসলাম এই জগতে এসেছে যাবতীয় জাগতিক ব্যপারকে জগত স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করে নফসের বান্দাদের খোদার বান্দা বানাবার জন্য। জাগতিক দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় আশয়কে কিভাবে এবং কোন নীতিতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করে খোদার সন্তোষ্টি লাভ দ্বারা পরকালে অনন্ত শান্তি লাভ সম্ভব হয় তার সর্বাধিক সুন্দর আদর্শ মানব হিসাবে মোহাম্মদ (সঃ আঃ) দুনিয়াতে এসেছিলেন সেই প্রশিক্ষণ হাতে কলমে

www.pathagar.com

শিক্ষা দিতে। তিনি তাই দিয়ে গেছেন। মিঃ হার্ট এত গভীরে গিয়ে মুক্তা কুড়াতে পারেননি, তাই তিনি আসল মুক্তার সন্ধানও পাননি। কিন্তু যতটুকু পেয়েছেন তাতেই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ আঃ) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সব জানলে রিলিজিয়ান আর সেক্যুলার কে আলাদা প্রয়োগ না করে এমন একটি শব্দে প্রকাশ করতেন যা দিয়ে একশব্দে সবই বলা হয়ে যেত। মিঃ হার্ট যাই বুঝেননা কেন, তিনি সেক্যুলারকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অর্থে কখনো বুঝেননি। তিনি একথা বুঝতে পারেন না এ জন্যে যে, তিনি পণ্ডিত লোক। তিনি ভাল ভাবে জানেন, সেক্যুলারের মধ্যে 'ধর্ম' নেই এবং কোন 'নিরপেক্ষতা'ও নেই। বাংলাদেশী ধর্মদ্রোহী চক্র দৈনিক পাচওয়াক্ত আজানের ধ্বনি শুনে, সাধারণ মুসলমানদের ধর্মানুরাগ দেখে, তবুও আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী হাফ নাস্তিক হাওয়ার্ড বেকার–এর 'সেক্যুলার ধর্ম হীনতা নয়', উক্তিটি মুখস্ত করে সাধারণ মুসলমানকে শুধু ধোকা দিয়ে থাকে। অথচ বেকারের জোড়াতালি অর্থ তার জীবদ্দশাতেই বাতিল হয়ে গেছে।

সেক্যুলার শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি তা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্বৃতিও পেশ করেছি, বর্তমান ও প্রাচীন অভিধানে সেক্যুলারের কি কি অর্থ করা হয়েছে তাও উল্লেখ করেছি। এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেক্যুলারিজম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ আমাদের জানা দরকার। আমার মতে সে তরজমা হচ্ছে ধর্ম–বিমুখ মতবাদ, ধর্মহীন মতবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি। আরবী পারসী ও উর্দু ভাষাভাষী লোক সেক্যুলারিজম শব্দের তরজমা লা–দ্বীনিয়াত শব্দ দ্বারা করে থাকেন। 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদ' হচ্ছে ভুল তরজমাকৃত একটি জোড়া তালি শব্দ। আমি এই সেক্যুলারিজমকে কানা মানুষের সংগে আর নাস্তিক্যবাদকে অন্ধ মানুষের সংগে তুলনা করি। কানা লোকের এক চোখ নেই। এক চোখে দেখে আর অন্য চোখে দেখতে পায়না। সেক্যুলার মানুষের ধর্মের চোখ নেই, শধু আছে বস্তুবাদী চোখ। ধর্মের কথা শুনলে মোনাফিকের মত মন খারাপ করে, রেগে যায় আর একচোখা কটাক্ষ করে। নাস্তিক মানুষের ধর্মের দুচোখই নেই। তারা 'ধর্ম কর্ম সমাজতন্ত্র' বললেও আসলে ধর্ম চায় না, আল্লাহর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেনা। আল্লাহতায়ালা তাদের দুচোখে এমন একটা ছানি দিয়ে রেখেছেন আর কানে দিয়ে রেখেছেন একটা বিশেষ পর্দা, ধর্মের কোন কিছু যখন তাদের সামনে ধরা হয়, তখন তাদের চোখের দৃষ্টি ঐ ছানিতে ঢাকা

www.pathagar.com

পড়ে যায়। তারা যখন ধর্মের কথা শুনে তখন কানের ঐ পর্দা কানের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়।

এবার আসুন তাদের কথা নিয়েই তাদেরকে বিশ্লেষণ করি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশটাকে স্থায়ীভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য দেশের উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত সেক্যুলারিস্টরা উঠে পড়ে লেগে যান। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের চারটি মৌলনীতির একটি ছিল সেক্যুলারিজম, তাদের ভাষায় 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'। সেক্যুলারিস্ট পণ্ডিতরা ভাবলেন, সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করা যায়না। তখন ১৯৭৩ সাল। ধর্মের করুণ অবস্থা। ধর্মের এই দুর্বল সময়ে যদি আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর উচ্চপর্যায়ের একটি সম্মেলন ডাকি আর তাতে সকল পণ্ডিত এসে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূলে রায় দেন এবং সে রায় যদি পাকাপাকি ভাবে জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া যায় তাহলে আমরা ইসলামকে মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে স্থায়ী ভাবে অন্তরীণ করে রাখতে পারবো, যেমন খৃস্টধর্মকে গীর্জায় আটকিয়ে রাখা হয়েছে।

এই লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে উনিশে বিশে ও একুশে আগষ্ট তারিখে শেরে বাংলা ফজলুল হক হল মিলনায়তনে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ওপর তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। তিনি দিন ব্যাপী এই আলোচনা সভায় অনেক পণ্ডিত অনেক নিবন্ধ পাঠ করেন এবং অনেকে বক্তব্যও রাখেন। বিভিন্ন অধিবেশনে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন দেশের শীর্ষ স্থানীয় পণ্ডিত। তাদের এসব বক্তব্য ও নিবন্ধ নিয়ে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' নামে বাংলা একাডেমী ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে একটি বই প্রকাশ করে। সেই পুস্তকের প্রথম নিবন্ধের লেখক হলেন অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা (অর্থনীতি বিভাগ), তিনি শুরুতেই বলেন, ''ব্যক্তিগত ভাবে কোন প্রথাবদ্ধ ধর্মেই আমার কোন আস্থা নেই এবং প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর আমার কাছে একটি ভ্রান্তি অথবা অবান্তর উপদ্রব বলে মনে হয়।'' আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে খোলা খুলি ভাবে বলেন, ''সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে যে ভাবে আচরিত ও রুপান্তরিত হয়ে আসছে আজ 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে' যদি তারই বাঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধু মাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়েনা। একথা সত্যযে, ধর্ম

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।

এভাবে এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের সংগে সংযোগহীন মতবাদ বলে রায় দেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচনাকারীদের এবং আলোচনা চক্রের নেপথ্যে অবস্থানকারী মোড়লদের আশাভঙ্গ হয়। আলোচনা চক্রের আলোচনা আর তাদের চক্র–চক্রান্ত ময়দানে পাত্তা পায়নি।

সে সময়ের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে 'শিক্ষার আদর্শ' শিরোনামের এক নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'বাংলাদেশ হওয়ার সূত্রপাতে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' যোগ করা হয়েছিল। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ জানতো না এবং নেতৃবৃন্দও জানতেন কিনা এনিয়েও সন্দেহ আছে। তার কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেতে লাগলো ধর্ম বিরোধীতায় রূপান্তরিত। মুসলমানী শব্দ তারা যেখানে পেলেন সেখানে থেকেই মুছে ফেলতে লাগলেন। যেমন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল হয়ে গেল সলিমুল্লাহ হল, জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিয়া কলেজে ইসলাম পর্যন্ত বাদ গেল। মোহামেডান স্পোর্টিংকেও ব্যাও করে দেয়া হলো। কেননা সেখানে মোহামেডান শব্দটা আছে। কি ধরনের বিফল চিন্তা, বিফল মানসিকতায় এরা ভুগছিল এর দ্বারাই বোঝা যায়। অর্থাৎ দেখা গেলো, ধর্ম নিরপেক্ষতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো সে অবস্থা ধর্মবিরোধী অবস্থা। প্রত্যেক দেশেই সব সময়ই কিছু লোক থাকে, থাকতে পারে, যারা ধর্মকে মান্য করেনা, বরঞ্চ ধর্ম বিরোধী চৈতন্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকে। বাংলাদেশেও এমন যারা ছিল তারা সকলেই একটি সাড়া পেয়ে গেলো, আনন্দিত হলো, উৎসাহিত হলো এবং এই উৎসাহের যোগান আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তখন পেয়েছিলাম। এর ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলো, সে পরিবর্তন হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা।"

www.pathagar.com

ওদের নিরপেক্ষতার স্বরূপ

নিরপেক্ষতা বা নিউট্রালিটি বলতে মানুষের মধ্যে কোন গুণও নেই দোষও নেই। পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষতার দাবি যিনি করেন, তিনিও তলে তলে পক্ষপাত রোগে ভোগেন। মানুষের মন আছে, মগজ আছে; সে মন আর মগজ কার ছোট আর কার বড় সেটা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। মন থাকলেই মনে নানা ছবির ছায়া পড়বে, সুখ দুঃখের অনুভূতিতে সঞ্জীবিত বা সঙ্কুচিত হবে, ভাল-মন্দ পৃথকীকরণে উন্মুখ হয়ে উঠবে। মনের গতি বিচিত্র। এই মুহূর্তে এখানে, পর মুহূর্তে দূর-দূরান্তে, কখনো উত্তর মেরুতে কখনো দক্ষিণ মেরুতে, কখনোবা আসমানের গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ায়। কারণ, মন স্বাধীন, কখনো সীমানার বেড়ায় আটকে রাখা যায় না। মগজ অবশ্য এত চঞ্চল নয়; কিন্তু অচল পয়সার মত গতিহীনও নয়। মন-মগজ ভাল ও মন্দ বুঝে গ্রহণ-বর্জনের নীতি মেনে চলে আর এ জন্যেই চিন্তা সমুদ্দুরের এই তীরে, না হয় ঐ তীরে ঠাঁই করে নেয়, মাঝ সমুদ্দুরে নিরপেক্ষতার ভেলায় কখনো ভেসে বেড়ায় না।

লাল রংগকে লাল রং, সবুজ রংগকে সবুজ রং বলতেই হবে, যদি বলার প্রয়োজন পড়ে। এখানে নিরপেক্ষ রং আবিস্কারের কোন অবকাশ নেই। নিরপেক্ষ থাকার অর্থ যদি বোবার মত কথা না বলা বুঝায় অথবা সমাজ সংসার থেকে পলায়নের নাম হয়, তাহলেও সেই বোবার ভূমিকা পালন আর সংসার থেকে পলায়ন উভয়ই এক ধরণের পক্ষপাতের নাম। নিরপেক্ষ বা নিউট্রালকে আমি ইংরেজী গ্রামারের নিউটার জেণ্ডার (ক্লীব লিঙ্গ) বলে আখ্যায়িত করে থাকি। নিউটার জেণ্ডার মার্কা মানুষই নিউট্রাল থাকার দাবি করে।

পক্ষ, বিপক্ষ আর নিরপেক্ষ, পক্ষের এই তিন অবস্থা। মুল শব্দ কিন্তু 'পক্ষ'। এই 'পক্ষ' শব্দটির আগে সুবিধা মত অক্ষর আর মাত্রা যোগ করে বিপক্ষ আর নিরপেক্ষ করা হয়েছে। উভয়ই 'পক্ষ' এর কাছে ঋণী। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তিন বন্ধু যথা রহিম, করিম আর জলিল। প্রথমে ওরা একই পক্ষের ছিল। কিন্তু কোন এক সিদ্ধান্তে মতভেদ দেখা দেয়ায় করিম হয়ে গেল রহিমের বিপক্ষ।

www.pathagar.com

জলিল কিন্তু করিম বা রহিমের পক্ষ না নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আপনি যদি বলেন, জলিল বেচারা নিরপেক্ষ, তাহলে আমি মানতে রাজি নই। কারণ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সে হয়তো প্রকাশ্যে কোন পক্ষ নিচ্ছে না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেও নিশ্চয়ই কোন এক পক্ষ নিয়ে বসে আছে। হয়তোবা এটা তার তৃতীয় পক্ষও হতে পারে। রহিমের বিপক্ষ করিম। সুতরাং পক্ষের বিপক্ষ এই 'নিরপেক্ষ' আসলে পক্ষেরই যথাক্রমে নেগেটিভ আর নিউট্রাল ক্লীব মার্কা রূপ। আমার মতের পক্ষে আমি, কিন্তু আমার মতের বিপরীতে যিনি আছেন তিনি আমার বিপক্ষ জন। ঐ একই কথা, যখন বিপক্ষজন বলবেন, তখন আমি হয়ে যাব তার বিপক্ষ আর তিনি হবেন তার পক্ষের মানুষ। সুতরাং পক্ষ বিপক্ষ স্থানভেদে যেমন নিশ্চল, তেমনি অদল-বদল সাপেক্ষ। নিরপেক্ষ ব্যক্তির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনায় বিশেষ অবস্থানে নিরপেক্ষ থাকলেও অন্য অবস্থায় পর মুহূর্তে নিজের ভাল-মন্দের ব্যাপারে অবশ্য পক্ষাবলম্বন করেন। যে হাকিম এজলাসে বসে বিচার করেন, তাঁকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলে সকলেই জানেন। সেই নিরপেক্ষ হাকিম কি কখনো পক্ষাবলম্বন করেন না? ন্যায়ের নিক্তিতে বাদী বিবাদীর দোষ-গুণ বিচার করে কাউকে দেন শাস্তি আবার কাউকে খালাস দেন। ন্যায়ের পক্ষে রায় দিয়ে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেন আবার অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করে অন্যায়ের বিপক্ষে নিজেকে প্রকাশ করেন। নিউট্রাল থাকার তাঁর কোন অবকাশ নেই। হাকিম ন্যায়ের পক্ষ। মামলা চলে তিন পক্ষে। এক পক্ষে থাকেন বাদী অপর পক্ষে থাকেন বিবাদী এবং তৃতীয় পক্ষে থাকেন বিচারক। বিচারকের হাতে থাকে ন্যায়ের কষ্টিপাথর, বাদী বিবাদীর বক্তব্য ও সাক্ষী-প্রমাণ সেই কষ্টিপাথরে ঘষে স্ব স্ব পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে খাঁটি ও মেকী ঘোষণা করেন। তিনি কখনো একথা ভাবেন না যে, আমি কেন দোষী নির্দোষী পরখ করতে যাই, দোষ গুণ বিচার করে বাদী অথবা বিবাদীর মনে আঘাত দিয়ে কি লাভ? হাকিম সাহেব যদি তাই করতেন তবে তার এজলাসে মানুষ যাওয়া তো দূরের কথা, কোন কাক পক্ষীও পথ ভুলে ঢুকতো না। একই পটভূমিতে বিচার করলে কোন মা বাবাও নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নন। সোহাগ শাসন দুইই করেন। এখন যে সন্তানকে সোহাগ করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন পরমুহূর্তে হয়তো কোন এক দুষ্টামীর জন্য সেই

www.pathagar.com

সন্তানকে বাবা ধমক দিচ্ছেন বা প্রহারও করছেন। নিরপেক্ষ মা বাবা এ ক্ষেত্রেও নিশ্চুপ এবং নিরপেক্ষ নন। সন্তানেরা যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে, মা বাবা শুধু দেখতেই থাকবেন, এই নিরপেক্ষতাকে কোন মা-বাবা মানেন না, মানতে পারেন না। খেলার মাঠে রেফারী খেলোয়াড়ের ভুল ত্রুটিকে ধরবেনই, তাতে ইট-পাথর বা কিল-ঘুষি মাথায় বা পিঠে পড়ুক আর নাই পড়ুক। শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে, নেতা তার সাথীদেরকে, রাজা তার প্রজাদেরকে সোহাগ-শাসন বা পুরস্কার-তিরস্কার করবেনই, এ সব ক্ষেত্রে মূর্তি সেজে নির্বাক অবস্থায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে নিরপেক্ষতার ভাণ্ডামী করা চলে না। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সৎসাহস যার নেই তারাই ক্লীব লিঙ্গ সেজে নিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরে দু'দিল বান্দার ভূমিকা পালন করে।

রাজনীতির অংগনেও নিরপেক্ষতার সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। অনেক নিরপেক্ষ দাবিদারদের সংগে সঙ্গোপনে আলাপ করে দেখা গেছে যে, তারাও কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন, তবে নিজেদের জাহির করেন না। ভোটের সময় ব্যালট পেপারে দেখে শুনেই সীল মারেন। সে সময় নিরপেক্ষতার ভুত কখনো ঘাড়ে চাপে না।

ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা আরেক পক্ষাবলম্বনের ভন্ডামী। অবিশ্বাস যেমন একধরণের বিশ্বাস, অস্বীকৃতি যেমন একধরণের নেতিবাচক স্বীকৃতি, অনাস্থা যেমন একধরণের আস্থার নাম, ঠিক তেমনি ধর্মনিপেক্ষতাও একধরণের ধর্মবিশ্বাসের নাম। পৃথিবীর যত দেশে. ধর্মনিরপেক্ষতার ডুগডুগি দিনরাত বাজানো হয়, সে সব দেশে বিশেষ বিশেষ ধর্মকে লালন পোষণ করতে গিয়ে চক্ষুশূল ধর্মগুলোকে উৎখাত করা হয়। চোখ মেললেই এই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষপাতিত্বের রক্তের হোলি খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় প্রতিবেশী ভারতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা পক্ষপাতিত্বের বদনামে মারাত্মকভাবে বদনামী।

নির্দলীয়দের যখন একটি দল গঠন হয় তখন নির্দলীয় চরিত্রটা থাকে কোথায়? এই তো ধরুন আমাদের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ব্যাপারটি। জোটমুক্তরা যখন জোট বাঁধেন তখনও কি জোটনিরপেক্ষ বলা যায়? প্রকৃতপক্ষে সকলেই

www.pathagar.com

কোন না কোন জোটে সাত পাকে বাঁধা আছেন অথচ সকলে মিলে জোট বেঁধেছেন জোটনিরপেক্ষতার নামে। পক্ষ বিপক্ষ ছাড়া যেমন অন্য কোন পক্ষ নেই তেমনি রোজ কিয়ামতে হাশরের বিচারের পর বেহেশত দোজখ ছাড়া চিরবাসের অন্য জায়গা নেই। হাঁ, অন্য যে স্থানটি আছে তা টেনজিট ক্যাম্প বলা যায় তবে স্থায়ী বাসস্থান বেহেশতে অথবা দোজখে, টেনজিট ক্যাম্পে নয়।

সত্য আর মিথ্যার মাঝামাঝি অন্য কোন শব্দ নেই। আলো আর আঁধারের মধ্যে আলো আঁধারী খেলা জমে না। দিন আর রাতের সময় সীমানা সীমিত, মধ্যখানে যে এজমালী ক্ষণিকের নিরপেক্ষ মূহুর্ত তা কাজে লাগানো যায় না, চোখের পলকে পার হয়ে রাতের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জেহাদের ময়দানে দু'টি মর্যাদাই স্বীকৃত– হয় শহীদ অথবা গাজী। নিরপেক্ষ একটি মর্যাদা অবশ্য আছে তবে তা মোনাফেকী। পাপকে পাপ, পাপীকে পাপী, পূণ্যকে পূণ্য, পূণ্যবানকে পূণ্যবান, দিনকে দিন আর রাতকে রাত বলতেই হবে। দিন–রাতের মাঝামাঝি সন্ধ্যার নিরপেক্ষতা নিয়ে দুষ্টু পেঁচা সেজে পাখির বাসায় হানা দেয়া যায়। 'আমি কাউকে চাই না' এই সোজা কথার যে বাঁকা অর্থ তা আহাম্মকও বুঝে। অর্থাৎ 'কাউকে চাই না' কিন্তু আমাকে অবশ্যই আমি চাই। আমাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে অস্বীকার করি। নিরপেক্ষতার বিদেশী শাড়ীর এই ফিনফিনে আঁচলে মুখ ঢেকে যারা সোজা আলিফ সেজে বর্ণমিছিলের প্রথম অক্ষর হয়ে মিছিলকে ব্যারিকেড দিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিরপেক্ষতার গোটা চেহারা আঁচলের ফাঁক দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ পায়। ওরা আসলে ভয়ঙ্কর পক্ষপাতের মানুষ। চিনে নেয়ার চোখ থাকলে সহজেই চেনা যায়। ওরা বাইরে নিউট্রাল সেজে নিউটার জেন্ডারের অপবাদ পর্যন্ত ঘাড়ে নেয়; কিন্তু এই মতলববাজ নিরপেক্ষবাদীদের আস্তিনের ভেতরে পক্ষপাতের বিষাক্ত ছোরা লুক্কায়িত থাকে।

নিরপেক্ষতায় কুটিলতার জিলাপী প্যাঁচ থাকে, দিক নির্ণয় করা যায় না, তাতে দিল খোলা মনের ছায়া পড়ে না, তারা সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারে না। নিরপেক্ষবাদীরা বকধার্মিক, মিনমিনে মোনাফিক, বড়ই খতরনাক, ওরা কার খালু ঠাওর করা যায় না। স্যাঁত স্যাঁতে জমিন চাষেরও অযোগ্য, তাতে কোন ফলন সহজে হয় না অথচ বুভুক্ষার দুনিয়ায় খামাখা জায়গা জুড়ে অভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

অতএব নিরপেক্ষতা বলতে এজগতে কোন বস্তু নেই। নিরপেক্ষতা একটা ধাপ্পা। পক্ষ বিপক্ষ স্পষ্টবাদিতার মধ্যে দিয়ে খোলা মন নিয়ে একে অন্যকে আলিংগন করতে পারে। কারণ উভয়ই মুক্ত মনের অধিকারী, ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষরা না ঘরকা, না ঘাটকা। শত্রুও নেই, মিত্রও নেই, অথচ অনিষ্টের চুড়ামণি; অতএব সাবধান।

একজন নিবন্ধকার ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তার মন্তব্যটি হচ্ছে এই, "কেউ খাদ্য যোগাড় করে যদি ভক্ষণ না করে 'খাদ্য নিরপেক্ষ' থেকে যায়, তাহলে তার যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি হবেনা; অনুরূপ ভাবে কাপড় তৈরী করে যদি কেউ তা পরিধান না করে 'কাপড় নিরপেক্ষ' থাকতে চায়, তাহলে নির্ঘাত শরমে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে আসবে। ধর্মকে ধারণ না করে যদি কেউ 'ধর্ম নিরপেক্ষ' থাকতে চায় তাহলে সে নিশ্চয়ই ধর্মের দাবি পূরণ করলো না। ধর্মাদেশ অমান্যকারী হিসাবে গণ্য হলো। কাপড় পরিধান করে না, এমন ব্যক্তিকে সেকারণে বস্ত্রহীন বলা যায়, ধর্ম পালন যে করেনা এমন ব্যক্তিকেও একই কারণে ধর্মহীন বলা যায়।"

বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রথম প্রবেশ

পাকিস্তান আমলের শুরুতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। দলটির নীতি আদর্শ যা ছিল তা সেক্যুলারিজম-এর প্রায় কাছাকাছি। মুসলিম জনতার সমর্থন লাভের জন্য অনিচ্ছা সত্বেও 'মুসলিম' শব্দটি জুড়ে রাখতে হয়। তাছাড়া সে সময়ের একমাত্র দলটির নাম ছিল মুসলিম লীগ। শুধু একারণেও ঐ দলের সংগে মিল রাখতে গিয়ে 'মুসলিম' শব্দটি যোগ করতে হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতন নাগরিকরা দেখলেন, তাদের জাতিগত নামে এই নতুন দেশে এ সময়ে দল গঠন করা কৌশলগত কারণে সঠিক হবেনা। সুতরাং তারা মনে করলেন, ঐ আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের নীতি আদর্শ তাদের চিন্তা ধারার অনেকটা কাছাকাছি। অতএব ভাবনা চিন্তা না করে সেই দলে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু বাধ সাধলো দলীয় নামের মধ্য ভাগের 'মুসলিম'

www.pathagar.com

শব্দটি। এ সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্য দলীয় নেতাদের কাছে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতা দেখা করলেন। তারা বললেন, আমরা তো আপনাদের দলেই প্রবেশ করতে চাই; কিন্তু আমরা 'আওয়াম' হয়েও 'মুসলিম' নই। তাই এই শিরোনামের দলীয় ছত্র ছায়ায় আমাদের অবস্থান নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতারা বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। সমাধানের পথও পেয়ে গেলেন। দলের সম্মেলন ডাকলেন। সমস্যাটি সামনে আনলেন। দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি কর্তন করার জন্য একজন প্রস্তাব করলেন। সেই সম্মেলনে 'মুসলিম' শব্দটি কাট হয়ে গেল, নতুন নাম ধারণ করলো 'আওয়ামী লীগ'। দলের ফটক খুলে গেল। সংখ্যা লঘুরা দলে দলে ঢুকে পড়লেন।

এদেশে দলকে সেক্যুলার করার এটাই ছিল প্রথম প্রয়াস। যে আদর্শের কাছে নীতি স্বীকার করে দলীয় যাত্রা সেদিন শুরু হয়েছিল, সেই আদর্শ নিয়ে সেই দল আজও সগৌরবে টিকে আছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রবেশের এই হলো শুরুর ইতিহাস। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে।

সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কি বস্তু এবং তার রূপ ও গন্ধ কি তা বোধহয় আমাদের কারো জানার ও বুঝার বাকি নেই। এতসব জানা ও দেখার পরও যদি কেউ বলেন, ধর্ম নিরপেক্ষ 'ধর্মহীনতা' নয়, তাহলে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জন্য একটি মাত্র ভদ্র জবাবই রয়েছে, তা হচ্ছে এই, হাঁ, আপনাদের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' মধ্যে 'ধর্ম' শব্দটি তো দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্টভাবে। তাই কেমন করে বলি, আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষতায় 'ধর্ম' নেই। তবে এই 'ধর্ম' 'আপনাদের সৃষ্ট ধর্ম তা কিন্তু সারে জাহানের স্রষ্টার দেয়া ধর্ম নয়। সেই স্রষ্টার ধর্মকে উৎখাতের জন্য আপনারা সৃষ্টি করেছেন আপনাদের 'ধর্ম।' আর আপনাদের নিরপেক্ষতা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র সস্ত্র লুকিয়ে রাখার প্রতারণামুলক সফেদ আবরণ। যে সব দেশে ইসলাম বিশেষভাবে সক্রিয় এবং অধিকাংশ মানুষের দ্বারা পালিত, সে সব দেশে ইসলামের মৌলনীতি ও আদর্শ উৎখাতের জন্য নাস্তিকরাও সেক্যুলার প্লাটফরম বেছে নেয়। তাই

www.pathagar.com

সেক্যুলারিজম এর–স্বরূপ উদঘাটনের জন্য এই দীর্ঘ আলোচনা করতে হলো।

আল্লাহ আমাদের সকলকে মুক্তমনে ভাল মন্দ জানবার ও বুঝবার এবং তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার তৌফিক যেন দেন, এই মোনাজাত তাঁর দরবারে পেশ করছি। আমিন।

www.pathagar.com

তথ্য-নির্দেশিকাগ্রন্থ সমূহ

১। Encyclopaedia Britannica, 1983 Edition, Fundamantalism Article.
২। ইসলামী বিশ্বকোষ (সংক্ষিপ্ত)- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।
৩। Islam and Madernism- Maryam Jameelah
৪। Islam the Misunderstood Religion- Muhammad Qutu b
৫। The World Almanac and Book of Facts.
৬। Ikhwan-ul-Muslemeen-Jafar Alam.
৭। ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান- আহমদ রায়েফ
৮। কারাগারে রাতদিন-জয়নব আল-গাযযালী
৯। A Dictionary of Politics-Florence Elliott and Michael Summer Skill.
১০। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ-সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
১১। কম্যুনিষ্ট শাসনে ইসলাম-ডঃ হাসান জামান
১২। রচনা সংকলন (১ম থেকে ৪ র্থ খণ্ড)- ভ, ই, লেনিন
১৩। আধুনিক রাষ্ট্র- ম্যাকাইভার
১৪। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য- সফিউদ্দিন জোয়ারদার
১৫। তুরস্কঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত- নুরী এরীন
১৬। ধর্ম ও নৈতিকতা বনাম সমাজতন্ত্র- মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
১৭ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র - কাণ্ডকাব সিদ্দিকী
১৮। সমাজতন্ত্রের ভ্রান্তি-মাওলানা গোলজার আহমদ
১৯। সৃষ্টির সেরা শত মানব- এম, এ, হক
২০। Chambers Dictionary (1968 Edition)
২১। Encyclopaedia Britannica Agnosticism Article.
২২। সেকিউলারিজম-ডক্টর হাসান জামান
২৩। ধর্ম নিরপেক্ষতা-বাংলা একাডেমী
২৪। দি হানড্রেড-মাইকেল এইচ হার্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com